মে ২০২৩ ▪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

বঙ্গবন্ধু, জুলিও কুরি পদক ও বিশ্বশান্তি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী

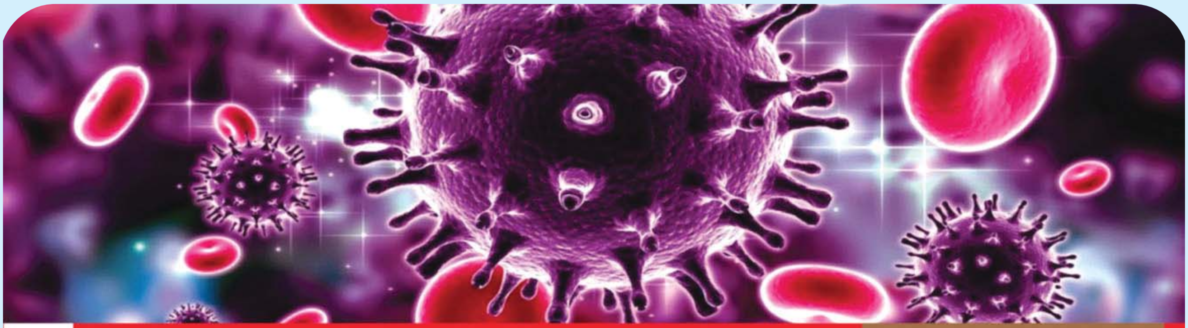

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

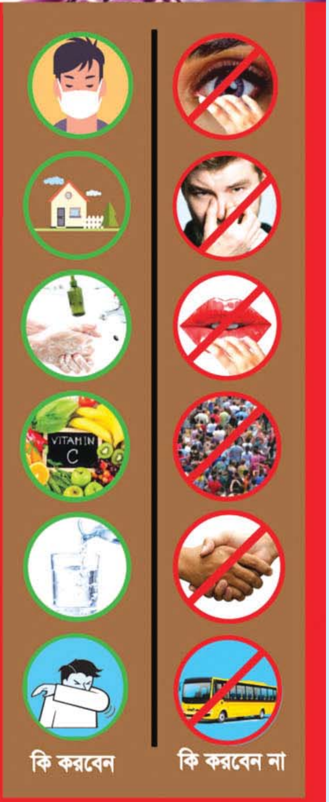

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মে ২০২৩ ❑ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

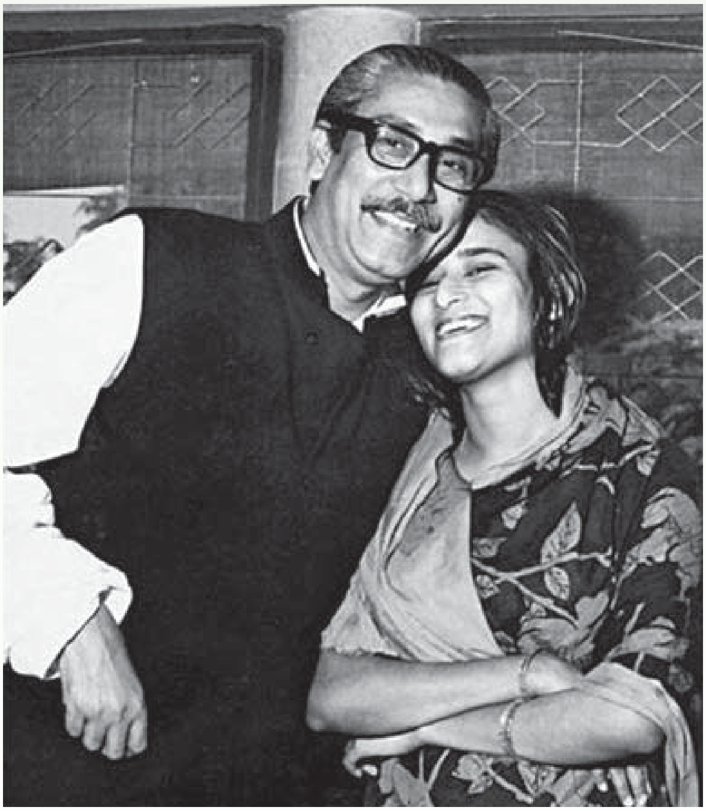

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর একান্ত সান্নিধ্যে শেখ হাসিনা

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ প্রাপ্তি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মাননা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্বশান্তি পরিষদের সভায় ১৪০টি দেশের ২০০ প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেন। এ অর্জনের মাধ্যমে তিনি পরিণত হন ‘বঙ্গবন্ধু’ থেকে ‘বিশ্ববন্ধু’তে। ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ‘বঙ্গবন্ধু, জুলিও কুরি পদক ও বিশ্বশান্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধ ও কবিতা রয়েছে এ সংখ্যায়।

পহেলা মে মহান ‘মে’ দিবস। ১৮৮৬ সালের মে মাসে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ, প্রাণ বিসর্জন এবং পরবর্তী ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয় বিজয়। বাংলাদেশে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারিভাবে পালিত হয়। মে দিবস উপলক্ষে এই সংখ্যায় আছে নিবন্ধ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার শাহাদতবরণকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা বিদেশে ছিলেন। বাংলার মানুষের ভালোবাসার টানে শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী ২৫শে বৈশাখ ১৪৩০। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর স্মরণে রয়েছে নিবন্ধ।

প্রেম, দ্রোহ ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর শানিত লেখনীর মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীকে পরিণত হন। তাঁকে নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া আছে নানা বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ। আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর মে সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

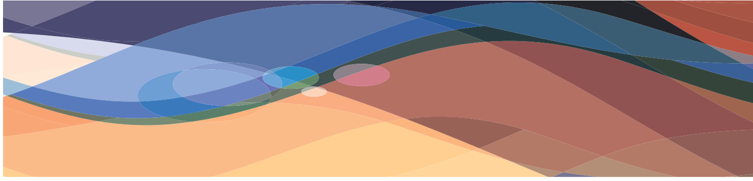

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধু, জুলিও কুরি পদক ও বিশ্বশান্তি ৪
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ভাবনা ৯
ড. মিল্টন বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের *কণিকা* ১৩
ড. আশরাফ পিন্টু

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ ১৫
ড. প্রণব কুমার পান্ডে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর ১৮

ইসলামি ঐতিহ্যের রূপকার নজরুল ২০
মো. আবদুল মান্নান

মানুষের অধিকার: মে দিবস ২৩
শ্যামল দত্ত

আল্লাহ এবং বিজ্ঞান ২৬
ম. মীজানুর রহমান

মায়ের চেয়ে আপন কেহ নাই ২৭
মঈনুল হক চৌধুরী

তথ্য অধিকার আইন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৮
সেলিনা আকতার

উচ্চ ফলনশীল জাত ‘বঙ্গবন্ধু’ ধানের ফলনে কৃষকের মুখে হাসি ৩০
কাজী মোতাহার রহমান

কবিতার মানুষ খালেদা এদিব চৌধুরী ৩১
রহিমা আক্তার মৌ

বজ্রপাত: প্রয়োজন সচেতনতা ৩৩
মাহমুদা শিউলী আক্তার

শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ৩৫
মো. বেলায়েত হোসেন

নিরাপদ মাতৃত্ব রক্ষায় সরকারের পদক্ষেপ ৩৬
তানজিনা চৌধুরী

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস এবং বাংলাদেশ ৩৭
শারমিন ইসলাম

বিশ্ব পরিবার দিবস: পরিবার হোক নিরাপদ আশ্রয়স্থল ৩৯
প্রশান্ত দে

গল্প

সুখনের আন্তরিকতা ৪১
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

কবিতাগুচ্ছ ৪৪-৪৭
আসলাম সানী, আরিফ মঈনুদ্দীন, মিলন সব্যসাচী, সুজিত হালদার, মিলি হক, আহসানুল হক, শাহ আলম বিল্লাল, সোহেল বীর, সেহাঙ্গল বিপ্লব, বিচিত্র কুমার, মো. আব্দুল আউয়াল রণী, রুহুল গনি জ্যোতি, ইমরুল ইউসুফ, আবু জাফর আবদুল্লাহ্, প্রজীৎ ঘোষ, বশিরুজ্জামান বশির

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৮
প্রধানমন্ত্রী ৪৯
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫০
শিক্ষা ৫২
উন্নয়ন ৫৩
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৪
অর্থনীতি ৫৫
নারী ৫৬
কৃষি ৫৭
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৮
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৯
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬০
ক্রীড়া ৬০

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
না ফেরার দেশে পঙ্কজ ভট্টাচার্য ৬২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

বঙ্গবন্ধু, জুলিও কুরি পদক ও বিশ্বশান্তি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি তুলে ধরে বলেন, 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এই নীতিতে আমরা আস্থাশীল।' তিনি সবসময় দেশ-বিদেশে শান্তিকামী জনগণকে সমর্থন করেন এবং তাদের পাশে দাঁড়ান। শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বশান্তি পরিষদ সর্বোচ্চ সম্মান 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করে 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ বছর বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী। এ নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু, জুলিও কুরি পদক ও বিশ্বশান্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা–৪

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। ১৮৮৬ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। আন্দোলন তীব্র হলে পুলিশ গুলি করে। এতে ১১ জন শ্রমিক নিহত হন। আহত ও গ্রেপ্তার হন বহু শ্রমিক। পরে গ্রেপ্তার ছয় শ্রমিককে প্রহসনের বিচারে ফাঁসিও দেওয়া হয়। এতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। অবশেষে দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় সরকার। বিজয় হয় শ্রমিকদের। মে দিবস নিয়ে 'মানুষের অধিকার: মে দিবস' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা–২৩

১৭ই মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ছয় বছরের নির্বাসন শেষে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এক নতুন যুগের সূচনা করে বিধায় বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৭ই মে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালিত হয়। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে 'শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ভাবনা' এবং 'শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–৯ ও ১৫

রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী

২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে 'রবীন্দ্রনাথের *কণিকা*' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা-১৩। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী ১১ই জ্যৈষ্ঠ। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর শানিত লেখনীর মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীকে পরিণত হন। তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে 'ইসলামি ঐতিহ্যের রূপকার নজরুল' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা-২০

বঙ্গবন্ধু, জুলিও কুরি পদক ও বিশ্বশান্তি

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তিনি বাঙালির প্রধানতম জাতীয়তাবাদী নেতা। বাঙালির সম্মিলিত চেতনায় জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে তিনি পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। গণতান্ত্রিক মূল্যচেতনা, শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা– এই ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী ভাবনার মূলকথা। জাতীয়তাবাদের এই মূলমন্ত্রকে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন বাঙালি চেতনায়। এভাবেই ইতিহাসের অনিবার্য দাবিতে তিনি হয়ে উঠেছেন বাঙালির অবিসংবাদিত জাতীয়তাবাদী নেতা– বাঙালির মুক্তি আর স্বাধীনতার অনন্য প্রতিভূ। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থেই অভিন্ন ও একাত্ম। বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে অনিবার্যভাবে এসে যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা। জনগণের স্বার্থের সঙ্গে, দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে তিনি একাত্ম করতে পেরেছিলেন অবলীলায়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, দেশের স্বার্থের কাছে, জনগণের স্বার্থের কাছে তিনি নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। এক অর্থে, বঙ্গবন্ধুই একটা ইতিহাস। তাঁর জীবন ও কর্মের ক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা বিশেষ সময় খণ্ডের কথা আমরা জানতে পারি।

শোষক ও শোষিতের সংগ্রামে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির শৃঙ্খল থেকে তিনি বাঙালি জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন দেশকে স্বাধীন করতে। এই মুক্তির সংগ্রামে তিনি নিজেকে তুচ্ছ ভেবে জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, কিশোর বয়স থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন প্রতিবাদ, সর্বদা বলেছেন সত্য, ন্যায় ও শান্তির কথা– এভাবে হয়ে উঠেছেন স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথ থেকে তিনি কখনো দূরে সরে যাননি। ভীতি ও অত্যাচারের মুখেও সর্বদা তিনি সত্য, ন্যায় ও শান্তির কথা বলেছেন, শোষিত মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর এই নির্ভীক অবস্থানের কারণে তিনি কেবল বাংলাদেশেই নয়, শোষিত-নির্যাতিত বিশ্ব মানবসমাজেরও অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি, ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত আলজিয়ার্সের জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কথা, যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত, শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে'। (Syed Mohammad Shahed, 2021: 58-59) জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন– এসব স্থানে শোষিত মানুষের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়, বিশ্বের শোষিত-নির্যাতিত মানুষ বাঙালির বঙ্গবন্ধুকে বরণ করে নেয় নিজেদের নেতা হিসেবে। এ কারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরম মিত্র ইন্দিরা গান্ধী বলেন এই কথা– 'শেখ মুজিব ছিলেন একজন মহান নেতা। তাঁর অনন্য সাধারণ সাহসিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জন্য প্রেরণাদায়ক ছিল' (মীর মোশাররফ হোসেন, ২০১৯:১৯)। কিংবা ফিদেল ক্যাস্ত্রোর মতো বিশ্বনেতা বলেন এই কথা– 'আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়।... শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারালো তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম হৃদয়ের বন্ধুকে' (মীর মোশাররফ হোসেন, ২০১৯:১৯)।

বিশ্ব ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো জাতীয়তাবাদী নেতার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনিই বিশ্বের একমাত্র নেতা, যিনি জাতীয় পুঁজির আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা ও জনগণের সম্মিলিত মুক্তির বাসনাকে এক বিন্দুতে মেলাতে পেরেছেন। এ কারণেই তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, এ কারণেই তিনি আমাদের জাতির পিতা। সবার স্বপ্নকে তিনি একটি গ্রহণযোগ্য মোহনায় মেলাতে পেরেছেন। বিশ্ব ইতিহাসে কোনো জাতীয়তাবাদী নেতার কর্মসাধনায় আমরা এই যুগল স্রোতের মিলন লক্ষ করি না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণতন্ত্রের অতন্দ্র সৈনিক। তাঁর কর্ম ও সাধনা, চিন্তা ও ধ্যানে সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকেছে বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো– আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা' (এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০: ২৯১)। বস্তুত এই আন্তরিক উপলব্ধি এবং বিশ্বাসই ছিল তাঁর সকল কর্ম ও সাধনার কেন্দ্রীয় প্রেরণাশক্তি। কৈশোরকাল থেকেই তিনি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে ছিলেন সোচ্চার। আটচল্লিশ ও বাহান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আটান্নর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ– বাঙালির প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি পালন করেন নেতৃত্বের ভূমিকা। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান শক্তি-উৎস ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে তিনি ছিলেন সর্বদা বজ্রকণ্ঠ।

২

সারাটা জীবন আন্দোলন-সংগ্রামে অতিবাহিত হলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শান্তির অতন্দ্র সৈনিক। বস্তুত, সামগ্রিক কল্যাণ আর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন-সংগ্রাম।

প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন শান্তিবাদী রাজনীতিবিদ। শান্তি আর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণেও সংগ্রামের ডাকের পাশেই ছিল আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান। ভাষণে শর্ত যুক্ত করে আলোচনার পথ তিনি খোলা রাখলেন, অপরদিকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিও ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার আগে সামরিক জান্তার উদ্দেশে চারটি শর্ত উচ্চারণ মূলত তাঁর শান্তিবাদী রাজনৈতিক দর্শনেরই কুশলী প্রকাশ। এ কারণেই সামরিক জান্তা চেষ্টা করেও তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেনি। ৭ই মার্চের ভাষণে সেনানিবাসের পাকিস্তানি সৈন্যদের উদ্দেশে উচ্চারিত বাক্যে বঙ্গবন্ধুর শান্তিবাদী দর্শন ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না’। অন্যদিকে, দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাঁর ওপর চালানো হয় নির্মম নির্যাতন, হত্যা করা হয় ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে, ধ্বংস করা হয় গোটা দেশ, তবুও স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে তিনি যে ভাষণ দেন সেখানে পাকিস্তানের প্রতি তিনি কোনো বিদ্বেষ উচ্চারণ করেননি, বরং সেখানে আছে এই শান্তির বাণী:

> পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা– আপনারা অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করেছেন, অসংখ্য বাঙালি মা-বোনের অসম্মান করেছেন, তবু আমি চাই আপনারা ভালো থাকুন।... আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আমরা স্বাধীন, এটা মেনে নিন। আপনারা স্বাধীনভাবে থাকুন। (এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০: ২৯১-২৯২)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বভার কাঁধে নিয়েই তিনি ঘোষণা করেন : ‘আমরা একটি ছোট রাষ্ট্র, আমাদের সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে এবং কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়।’ ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন এই শান্তিপ্রিয় পররাষ্ট্রনীতি: ‘আমি দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই; কারো সঙ্গে দুশমনি করতে চাই না। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমরা শান্তি চাই’ (এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০ : ৪৪৯)। বঙ্গবন্ধুর শান্তিকামী পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শনই হলো– ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়’ এবং ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান’। জোটনিরপেক্ষ অবস্থানের কারণেই বিশ্বব্যাপী তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে তাঁর ভাষণ বিশ্ববাসী সাদরে গ্রহণ করেছে। তিনি কেবল নিজের দেশের মানুষের শান্তি আর কল্যাণ প্রত্যাশা করেননি, বরং প্রত্যাশা করেছেন বিশ্বমানবের শান্তি ও কল্যাণ। তাই জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে তিনি নিজেকে শোষিত মানুষের পক্ষে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে যখনই শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে, তখনই তিনি শান্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, শোষিত-বঞ্চিত-মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়েছেন আফ্রিকার বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, একাত্মতা ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে, ভিয়েতনামে মার্কিনি বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছিলেন সোচ্চার। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় বিদেশি শাসন-শোষণের চির অবসান কামনা করেছেন বঙ্গবন্ধু।

৩

বিশ্বশান্তির পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃঢ় অবস্থান পৃথিবীর শান্তিকামী নেতৃত্ব ও সংগঠনসমূহ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাঁকে বিশ্বশান্তির অতন্দ্র সৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ প্রসঙ্গেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত জুলিও কুরি শান্তি পদকের কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তি আন্দোলনের পুরোধা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করা হয়। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জুলিও কুরি ও পিয়েরে কুরি দম্পতি বিশ্বশান্তির জন্য যে অবদান রেখেছেন, তা চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বিশ্বশান্তি পরিষদ ১৯৫০ সাল থেকে ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে, মানবতার কল্যাণে এবং শান্তির পক্ষে বিশেষ অবদানের জন্য বরণীয় ব্যক্তি ও সংগঠনকে জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করে আসছে। ফিদেল ক্যাস্ট্রো, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, সালভেদর আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা, মাদার তেরেসা, পাবলো নেরুদা, জওহরলাল নেহেরু, মার্টিন লুথার কিং, লিওনিদ ব্রেজনেভ প্রমুখ বিশ্বনেতাকে এই পদকে ভূষিত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত এই পদকের নাম ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত ছিল শান্তি পদক (Medal of Peace)। ১৯৫৯ সাল থেকে এই পদকের নাম পরিবর্তন করে ‘জুলিও কুরি শান্তি পদক’ (Joliot-Curie Medal of Peace) রাখা হয়।

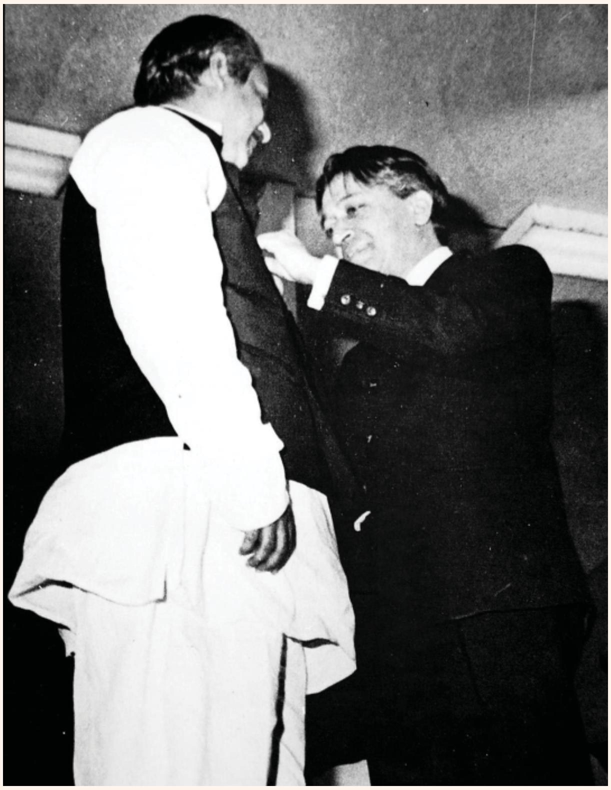

২৩শে মে ১৯৭৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশ চন্দ্র পদক পরিয়ে দিচ্ছেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শান্তিবাদী, কূটনীতি এবং বন্ধুসুলভ পররাষ্ট্রনীতির কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশ। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুর আজীবন সাধনার স্বীকৃতির প্রথম সাংগঠনিক উদ্যোগ গৃহীত হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের জন্য বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের নেতা আলি আকসাদ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্বশান্তি পরিষদের এই সভায় বিশ্বের ১৪০টি দেশের পরিষদের দুই শতাধিক প্রতিনিধির সম্মতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এশিয়ান পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি কনফারেন্স উপলক্ষে বিশ্বশান্তি পরিষদের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালের ২২-২৩শে মে ঢাকায় এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তি পরিষদের প্রতিনিধি ছাড়াও সমধর্মী বিভিন্ন সংগঠনের অনেক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ২৩শে মে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজায় উন্মুক্ত চত্বরে বিশ্বশান্তি পরিষদের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদান করেন। পদক প্রদানের সময় রমেশ চন্দ্র বলেন, 'শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ববন্ধুও বটে' (কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, ২০২৩ : ১৬)। ঢাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা কৃষ্ণা মেনন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা জন রিড প্রমুখ।

বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি পদক প্রাপ্তি বাঙালি জাতির জন্য অনন্য গৌরব। বঙ্গবন্ধু এই অর্জনকে ব্যক্তিগত না ভেবে সমগ্র জাতির বলে আখ্যায়িত করেছেন। পদক প্রাপ্তি উপলক্ষে ২৩শে মে তিনি যে ভাষণ দেন সেখানে তাঁর মহানুভবতা প্রকাশিত হয়েছে। সেদিনের ভাষণে প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেন:

> লাখো শহিদের রক্তের সিক্ত স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে প্রথম এশীয় শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহূত শান্তির সেনানীদের জানাই স্বাগতম। উপনিবেশবাদী শাসন আর শোষণের নগ্ন হামলাকে প্রতিরোধ করে ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা। তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে শান্তি আর স্বাধীনতা একাকার হয়ে মিশে গেছে। আমরা মর্মে মর্মে অনুধাবন করি বিশ্বশান্তি তথা আঞ্চলিক শান্তির অপরিহার্যতা। এই পটভূমিতে আপনারা বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সহকর্মী প্রতিনিধিরা আমাকে জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করেছেন। এই সম্মান কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়। এই সম্মান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহিদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের। জুলিও কুরি শান্তি পদক সমগ্র বাঙালি জাতির। এটা আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের। (কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, ২০২৩ : ১৮)

এশীয় শান্তি সম্মেলনের অধিবেশনে সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু আপন অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বশান্তির পক্ষে তাঁর সুদৃঢ় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি নিজে ১৯৫২ সালে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলীয় শান্তি সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি ছিলাম। বিশ্বশান্তি পরিষদের ১৯৫৬ সালের স্টকহোম সম্মেলনেও আমি যোগ দিয়েছিলাম। একই সাথে এটাও আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চাই, বিশ্বশান্তি আমার জীবনদর্শনের মূলনীতি। নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত, শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ যে-কোনো স্থানেই হোক না কেন, তাদের সাথে আমি রয়েছি' (কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, ২০২৩:১৯)। বঙ্গবন্ধু মনে করেন পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিধর দেশসমূহের অস্ত্র প্রতিযোগিতাই বিশ্বশান্তির পথে প্রধান অন্তরায়। কতিপয় দেশ অস্ত্র প্রতিযোগিতার খোলসে অস্ত্র-ব্যবসায় অন্ধ হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতাই বিশ্বশান্তির পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। সংবর্ধনা সভায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বৃহৎ শক্তিবর্গকে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে শান্তির পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন,

> আমরা চাই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকুক, তাকে সুসংহত করা হোক। বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষভাবে আগ্রাসী নীতির অনুসারী কতিপয় মহাশক্তির অস্ত্রসজ্জা তথা অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে আজ এক সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা চাই, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত অর্থ দুনিয়ার দুঃখী মানুষের কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করা হোক। তা হলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ মুছে ফেলার কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে। আমরা সর্বপ্রকারের অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দুনিয়ার সকল শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী বলেই বিশ্বের সব দেশ ও জাতির বন্ধুত্ব কামনা করি। 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'– শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এই নীতিতে আমরা আস্থাশীল। তাই সামরিক জোটগুলোর বাইরে থেকে সক্রিয় নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি আমরা অনুসরণ করে চলেছি। শুধু সরকারের নীতিই নয়, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি সুদৃঢ় করা আমাদের সংবিধানের অন্যতম অনুশাসন। (কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, ২০২৩:১৯)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছিলেন এক আপোশহীন সংগ্রামী। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন মানবকল্যাণ ও স্বাধীনতার জন্য শান্তির অপরিহার্যতা। পৃথিবীব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাই তিনি নিজের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'আমাদের মুক্তিসংগ্রামের আলোকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূল্য আমরা অনুধাবন করেছি। আমরা জানি, মুক্তিকামী মানুষের ন্যায়সংগত সংগ্রাম অস্ত্রের জোরে স্তব্ধ করা যায় না। সে জন্য ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, অ্যাঙ্গোলা মোজাম্বিক, গিনি বিসাউসহ দুনিয়ার সকল উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামের প্রতি আমরা জানিয়েছি অকুণ্ঠ সমর্থন। আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি অন্যায়ভাবে আরব এলাকা ইসরায়েল কর্তৃক জোরপূর্বক দখলে রাখার বিরুদ্ধে। আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে নিন্দা করি দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের সকল স্থানের বর্ণভেদকারী নীতির। আমরা সমর্থন জানাই বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও মানবকল্যাণের যে-কোনো মহৎ প্রচেষ্টাকে। বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণ আমাদের অন্যতম মূলনীতি হওয়ার জন্যই শুরু থেকে আমরা এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির জন্য চেষ্টা করে আসছি' (কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, ২০২৩: ১৯-২০)।

জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির জন্য ১৯৭২ সালের ২০শে নভেম্বর আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনার জন্য এক সভার আয়োজন করে। ওই সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাজীবনের অনুসৃত শান্তিদর্শনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন যে, বাংলার মানুষ শান্তিকামী মানুষ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক শক্তি বার বার শোষণ-নির্যাতনের উদ্দেশ্যে বাঙালির শান্তি বিনষ্ট করেছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর অস্ত্র প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করে এই সংবর্ধনা সভায়ও তিনি বলেন, 'আজ দুঃখের সঙ্গে আমাদের বলতে হয়, ... দুনিয়ায় যারা আজ শক্তিশালী দেশ, যারা আজ অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মত্ত, যারা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে ধ্বংস করার অস্ত্র তৈরি করার জন্য, তারা যদি এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা না করে এই সম্পদ যদি দুনিয়ার দুঃখী মানুষের জন্য ব্যয় করতো, তাহলে দশ বছরের মধ্যে দুনিয়াতে কোনোও দুঃখী মানুষ না খেয়ে কষ্ট পেতো না। তাঁরা যখন কথা বলেন, ... তাঁরা যখন বড়ো বড়ো বোম তৈরি করেন মানুষকে ধ্বংস করার জন্য এবং পাশে পাশে শান্তির কথা বলেন, তখন সত্যিই কষ্ট হয়' (এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০:৪২১)। বিশ্বশান্তির জন্য নিজের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করেন এভাবে– 'আমরা দুনিয়ার সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। ...আমার দেশের বৈদেশিক নীতি পরিষ্কার। আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি Independent Neutral Non-allied Foreign Policy... এই নীতিতে বাংলার মানুষ অটুট থাকবে। সকলের সঙ্গে বন্ধু হয়ে বাস করতে চাই। বাংলার মাটি শান্তির জন্য' (এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০:৪২৪) ১৯৭২ সালের ১১ই অক্টোবর গণভবনে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু সেই সাক্ষাৎকারে বলেন,

> বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রাম করেছে নির্যাতন আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এজন্যই তারা জয়ী হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের নির্যাতিত মানুষের এমনই ধরনের সংগ্রামের প্রতি আমার সমর্থন চিরদিন থাকবে। আমি চাই, এ বিশ্বের বুক থেকে নির্যাতনের শেষ অস্তিত্বও মুছে যাক। আমি শান্তির জন্য কাজ করে যাব। আর আমার এ কাজের জন্য কেউ স্বীকৃতি দিক আর না দিক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ আমার নেই। হানাহানি আর কাটাকাটি বন্ধ করে যেদিন বিশ্বের সকল মানুষ শান্তির জয়গানে ভুবন ভরে তুলবে, যেদিন বিশ্বের দুঃখী আর নির্যাতিত মানুষের মুখে প্রশান্তির

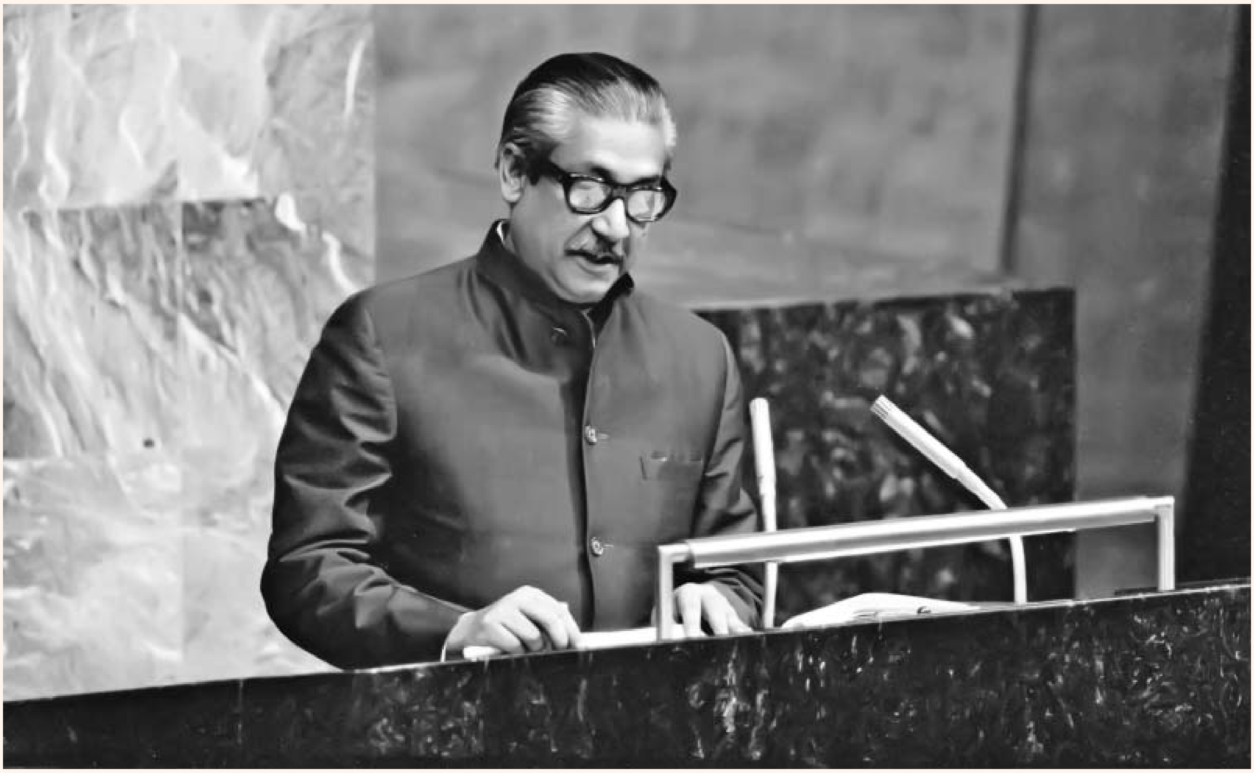

> হাসি ফুটে উঠবে, সেদিনই সার্থক হবে আমার শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যেদিন নির্মেঘ নীল আকাশের বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেত কপোতেরা বিনা দ্বিধায় উড়ে বেড়াবে, যেদিন দুষ্ট বাজপাখি শ্বেত কপোতের ডানা ভাঙার জন্য ছোঁ মারবে না, সেদিনই এ বিশ্বে নেমে আসবে শান্তির বারিধারা। (*বাংলার বাণী*, ১২.১০.১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সভায় সবসময় বিশ্বশান্তির কথা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেছেন। ১৯৭৩ সালের ৩রা আগস্ট কানাডার অটোয়ায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যোগ দেন। সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘ আমরা শান্তির জন্য সর্বাত্মকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাত্র সেদিন আমরা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দুর্ভোগ পোহাইয়াছি এবং জনগণের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের জন্য বর্বর শক্তির ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। সুতরাং, শান্তির জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি সর্বাত্মক। আমরা সব সময় এই কথাই বলিয়াছি যে, সংশ্লিষ্ট-পক্ষগুলো সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে একসঙ্গে বসিলে সমস্ত অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান করা সম্ভব।... উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আমরা এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে-কোনো প্রয়াসকে আন্তরিক সহযোগিতা দান করিব। সংঘর্ষ সংঘাতমুক্ত ও পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন পরিবেশকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৪.০৮.১৯৭৩)। ১৯৭৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের ৪র্থ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন, সেখানে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বলেন,

> The strategy of peace must also provide for an end to the arms race and for total and complete disarmament. Mankind must be rescued from the folly of proliferation of the weapons of destruction and the colossal waste of resources that it involves. These valuable resources should be diverted to meet all urgent human needs. ... peace, freedom and emancipation from exploitation have to be won. (Syed Mohammad Shahed, 2021: 61-62)

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। ঐ ভাষণেও শান্তির সপক্ষে তাঁর অবিচল সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন তিনি। ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখবে। আমাদের অঞ্চলের এবং বিশ্বের শান্তি অন্বেষায় সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। ... নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটছে। আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। তার লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদের গড়ে তুলবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা এগিয়ে যাব’ (এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০: ৫০২-০৩)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জীবন ধরেই শান্তির জন্য কাজ করেছেন, বিশ্বশান্তির পক্ষে কথা বলেছেন। বিশ্ব মানবসমাজ তাঁর এই কাজের স্বীকৃতিও দিয়েছে। জুলিও কুরি শান্তি পদকের মতো তিনি মর্যাদাশীল ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ‘গান্ধী শান্তি পুরস্কার’ও অর্জন করেন। ২০২০ সালে ভারত সরকার বঙ্গবন্ধুকে মরণোত্তর গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শোষিত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য তিনি যে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, গান্ধী শান্তি পুরস্কার তারই স্বীকৃতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বে যাঁরা গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের তালিকা দেখলেই বোঝা যায় এই পুরস্কারের মর্যাদা ও তাৎপর্য। গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হচ্ছেন– তানজানিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়েরের, শ্রীলঙ্কার সর্বোদয় শ্রমদান আন্দোলনের প্রবর্তক এ টি অরিয়ারত্নে, কুষ্ঠ ও পোলিও রোগ নির্মূল করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পরিচিত জার্মান রাজনীতিবিদ গেরহার্ড ফিশার, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা, উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজনীতিবিদ জন হিউম, চেক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ভাকল্যাভ হ্যাভেল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের পত্নী কোরেটা স্কট কিং, দক্ষিণ আফ্রিকার ধর্মযাজক ও অধিকার আন্দোলনকর্মী ডেসমন্ড টুটু, জাপানের মানবাধিকার সংগঠক ও সমাজসেবক ইয়োহেই সাসাকাওয়া, ওমানের প্রাক্তন সুলতান কারুস বিন সাইদ আল সাইদ প্রমুখ।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তি যে-কোনো ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনন্য গৌরবের বিষয়। বঙ্গবন্ধুর এই পদক প্রাপ্তি কেবল তাঁর জন্যই নয়, এটা ছিল বাংলাদেশের জন্য প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সম্মান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিশ্বশান্তির অতন্দ্র সৈনিক। তাঁর শান্তিবাদী দর্শন বর্তমানকালের জন্যও সমান মাত্রায় প্রাসঙ্গিক। পঞ্চাশ বছর পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করা হয়েছিল। আজও পৃথিবীর নানা প্রান্তে অশান্তি বিরাজ করছে, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের ওপর নানামাত্রিক আক্রমণ চালাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর শান্তিবাদী দর্শন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শান্তিবাদী দর্শন অনুসরণ করলে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে– এ আমাদের আত্যন্তিক বিশ্বাস (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০২৩:১১১)।

তথ্যসূত্র

- এ কে আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), ২০২০, *শেখ মুজিবুর রহমান: ভাষণসমগ্র*, ঢাকা, চারুলিপি
- কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, ২০২৩, *বঙ্গবন্ধু ও জুলিও কুরি শান্তি পদক*, ঢাকা, জার্নিম্যান বুক্স।
- বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০২৩, *মুজিবমঙ্গল*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
- মীর মোশাররফ হোসেন (সম্পাদক), ২০১৯, *জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শততম জন্ম স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা ও কিশোর বাংলা।
- Syed Mohammad Shahed (editor), 2021, *Contemporary World: Bangabandhu’s Vision*, Dhaka, United Nations Association of Bangladesh.
- *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ০৪.০৮.১৯৭৩
- *বাংলার বাণী*, ঢাকা, ১২.১০.১৯৭২

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ: সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, bgdubd2023@gmail.com

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের ভাবনা

ড. মিল্টন বিশ্বাস

টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকারের চার বছর পূর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে ২০২৩ সালের ৬ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৪ বছরে তাঁর সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারিত খতিয়ান দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমাদের দেশ এগিয়েছে অনেক। তবে আরও এগিয়ে নিতে হবে। একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন আমাদের লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলা।" কীভাবে হবে সেই স্মার্ট বাংলাদেশ? সে সম্পর্কেও তিনি বিশদ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এখানে কেবল স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে স্বপ্ন ছিল– স্বাধীন বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে তা বাস্তবে পরিণত হয়। ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বরের স্বপ্ন ছিল– 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং তা ২০২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ২০২২ সালের ১২ই ডিসেম্বর সদ্য ঘোষিত স্বপ্ন 'স্মার্ট বাংলাদেশ'– ২০৪১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে বাস্তবে পরিণত হবে। সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের যুগে আছি। কিন্তু কীভাবে আমরা এই যুগে পৌঁছালাম, কার নেতৃত্বে এটা সম্ভব হলো– সে ইতিহাস খুঁজতে হলে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে তাঁর আপোশহীন লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে হবে।

২

'মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মহান পিতার স্বপ্নবুকে/ নিরন্তর যিনি আজ এ জাতির মুক্তির দিশারি/ ঘূর্ণিঝড়ে হালভাঙা নৌকাখানি শক্ত হাতে বৈঠা ধরে টেনে/ অসীম মমতা দিয়ে পৌঁছুচ্ছেন আমাদের স্বপ্নের মঞ্জিলে'– তিনি হলেন বিশ্বনেত্রী শেখ হাসিনা। একথা সর্বজনগ্রাহ্য, শেখ হাসিনা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী, তিনি মুক্তির দিশারি, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছেন নির্ভীকভাবে আর গভীর মমতা দিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট। আসলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, তেমনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এদেশের শাসনকার্যে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আসীন থেকে মহিমান্বিত রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মহাকালকে স্পর্শ করতে সক্ষম। এর কারণ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি লিখেছেন– 'আমাদের অধিকাংশেরই সুখ-দুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়।...কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখ-দুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্য পরম্পরা যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান কালসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।'

অর্থাৎ শেখ হাসিনার সুখ-দুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে বদ্ধ। কারণ তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা। অন্যদিকে বিশ্বকবির ভাবনা সূত্রে বলা যায়, শেখ হাসিনাকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলে নয়, বরং মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখতে হলে, দূরে দাঁড়াতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁকে স্থাপন করতে হয়, তিনি যে সুবৃহৎ রাজনৈতিক অঙ্গনে ৪১ বছর প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আছেন, তাসহ তাঁকে এক করে দেখতে হয়। এদিক থেকে তিনি 'ইতিহাস স্রষ্টা মহান ব্যক্তিত্ব'। খণ্ড ক্ষুদ্র বর্তমানকালে তাঁর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সংগ্রামকে একীভূত করে দেখতে হবে।

৩

অধিকারবঞ্চিত মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ হাসিনার ৪২তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তিনি ভারতে নির্বাসিত জীবন থেকে ফিরে এসেছিলেন প্রিয় জন্মভূমিতে। বাংলাদেশ তারপর থেকে নতুন করে পথ চলা শুরু করে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর এদেশ পুনরায় 'জয় বাংলা'র বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল। ৪২ বছর পূর্বের সেই দিনটি এখনকার মতো ছিল না। সেদিন ছিল ভারী বর্ষণ ও ঝড়ো হাওয়ার এক অপরাহ্ণ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত করেছিল। শেখ হাসিনার পদস্পর্শে সেই জল্লাদের দেশ পুনরায় সোনার বাংলা হয়ে ওঠার প্রত্যাশায় মুখরিত হয়েছিল সেদিন। আজ ২০২৩ সালে উপনীত হয়ে তার প্রমাণ পাচ্ছি আমরা।

চতুর্থবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনাভাইরাসের মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সংকট মোকাবিলা করে আজ বিশ্বে অভিনন্দিত। শাসনকার্যে সবসময় সংকট মোকাবিলা করা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এজন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তবে একথা সত্য, বিশ্ব মিডিয়ায় প্রশংসা পাবার জন্য শেখ হাসিনা কাজ করেন না। তাঁর

দিনপঞ্জিজুড়ে আছে মানুষের জন্য ব্যস্ত সময়ের কর্মকাণ্ড। আর তাঁর এই বর্তমান নেতৃত্ব সম্ভব হয়েছে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ফলে। ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার পর থেকেই তিনি গরিবের পক্ষে কল্যাণকর রাজনীতি শুরু করেন। এজন্য নিজের দলের নেতা-কর্মীদের মানুষের পক্ষে কাজ করার নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। প্রায় পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় শেখ হাসিনা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছের মানুষে পরিণত হয়েছেন।

অথচ ১৭ই মে তাঁর দেশে ফেরা ছিল অতি সাধারণ, কারণ সেভাবেই তিনি দেশের জনগণের সামনে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। সেদিন তিনি এক বৃহৎ শূন্যতার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এদেশে তাঁর ঘর নেই; ঘরের আপনজনও কেউ নেই। তাই সারা দেশের মানুষ তাঁর আপন হয়ে উঠল। তিনি ফিরে আসার আগে ছয় বছর স্বৈরশাসকরা বোঝাতে চেয়েছিল তারাই জনগণের মুক্তিদাতা। কিন্তু সাধারণ মানুষ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছিল, বিচার দাবি করছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের। সেনা শাসকের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকায় জনগণের শাসনের দাবি নিয়ে রাজনীতির মাঠে রাতদিনের এক অক্লান্ত কর্মী হয়ে উঠেছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি নেতা কিন্তু তারও বেশি তিনি কর্মী। কারণ দলকে ঐক্যবদ্ধ করা, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে অপপ্রচারের সমুচিত জবাব দেওয়া, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা তাঁর প্রাত্যহিক কর্মে পরিণত হলো। দেশে ফেরার প্রতিক্রিয়ায় আবেগসিক্ত বর্ণনা আছে তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থগুলোতে। কবি নির্মলেন্দু গুণ বলেন, শেখ হাসিনা যখনই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়িতে পা রেখেছিলেন তখনই বুঝে নিয়েছিলেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু পথ।' তাঁর 'পথে পথে গ্রেনেড ছড়ানো'। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের (১৯৮১ সালের ১৭ই মে) আগে ৫ই মে বিশ্বখ্যাত *নিউজউইক* পত্রিকায় বক্স আইটেমে তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, জীবনের ঝুঁকি আছে এটা জেনেও তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ২৪শে মার্চের সামরিক শাসন জারির দুইদিন পর স্বাধীনতা দিবসে একমাত্র শেখ হাসিনাই সাভার স্মৃতিসৌধে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি সামরিক শাসন মানি না, মানবো না। বাংলাদেশে সংসদীয় ধারার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবোই করবো।' তাই তো কবি ত্রিদিব দস্তিদার শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, 'আপনিই তো বাংলাদেশ'।

৪

প্রকৃতপক্ষে ১৭ই মে এদেশের ইতিহাসের মাইলফলক। সেদিন থেকেই দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে দ্রুত দৃশ্যপট পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে বঙ্গবন্ধু ও জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ ছিল। সেদিন থেকেই সেই স্লোগান প্রকম্পিত হয়ে উঠল আকাশে-বাতাসে; রাজপথ জনগণের দখলে চলে গেল। সেনাশাসক এতদিন শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সেই বছরই শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সেদিন ঢাকায় লক্ষ মানুষের বাঁধভাঙা স্রোত তাঁকে কেন্দ্র করে সমবেত হয়েছিল। তাদের কণ্ঠে ছিল বিচিত্র ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। 'শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম', 'শেখ হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।' আবালবৃদ্ধ জনতা আবেগে অশ্রুসিক্ত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন– 'মাগো তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব।'

সেদিনের প্রত্যয় শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারই বাস্তব করে তুলেছেন। জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডের কয়েকজন খুনির ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। বাকি পলাতক আসামিদের ফিরিয়ে এনে শীঘ্রই ফাঁসি দেওয়া হবে বলে আমরা মনে করি। ১৭ই মে সম্পর্কে *দৈনিক বাংলায়* প্রকাশিত সংবাদ ছিল এরকম– 'ঐদিন কালবোশেখির ঝড়ো হাওয়ার বেগ ছিল ৬৫ মাইল। এবং এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে লাখো মানুষ শেখ হাসিনাকে এক নজর দেখার জন্য রাস্তায় ছিল।' দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমানটি ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ

করে। বিমান থেকে নেমেই তিনি দেশের মাটিতে চুমু খান। এ সময় বিপুল জনতার বিচিত্র স্লোগান মুখরিত করে তুলেছিল ঢাকার রাজপথ। যেন সূর্যোদয় হয়েছে, নতুন দিনের পথ চলা শুরু হলো। অশ্রুসজল সেই দিনের কথা আছে নানাজনের স্মৃতিচারণে। ঢাকা শহর তখন মিছিলের নগরী। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে বিকাল ৩.৩০ মিনিটের পর বিমানবন্দরের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমানটি মাটি স্পর্শ করার আগেই হাজার হাজার উৎসাহী জনতা সকল নিয়ন্ত্রণের সীমা, নিরাপত্তা বেষ্টনী অতিক্রম করে ফেলে। নিরাপত্তাকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতায় অবশেষে তিনি নেমে আসেন; হাত নেড়ে জনতাকে শুভেচ্ছা জানান। কিন্তু তাঁর অন্তরে ততক্ষণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। বিকাল ৪.৩২ মিনিটে শেখ হাসিনা একটি ট্রাকে ওঠেন। এ সময় বজ্র নিনাদে জনতার স্লোগান চলছিল। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত আব্দুর রাজ্জাক যখন ফুলের মালা পরিয়ে অভিবাদন জানান তখন বাঁধভাঙা কান্নার জোয়ার এসে ভাসিয়ে দেয় শেখ হাসিনাকে; কেঁদে ওঠেন তিনি। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি কেবল পাকিস্তানের কারাগার থেকে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গেই তুলনীয়।

শেখ হাসিনার ফিরে আসা খুব বেশি প্রয়োজন ছিল দেশ ও জনতার স্বার্থে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাঁর প্রত্যাবর্তনের আগে নৈরাজ্যের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হচ্ছিল মানুষ। পাকিস্তানি শাসক, দালাল-রাজাকার ও আন্তর্জাতিকভাবে কয়েকটি দেশের বাধা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এবং আপামর জনগণের অংশগ্রহণে ৯ মাসের মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার প্রচেষ্টা সফল হতে দেয়নি খুনিরা। ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট-পরবর্তী সামরিক শাসকদের অভ্যুত্থান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে। দেশ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়। দেশের প্রতিকূল এক সময়ে জননেত্রীকে আমরা রাজনীতির মঞ্চে পেলাম। তিনি দায়িত্ব নিলেন এবং লাখো জনতার সমাবেশে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আজকের জনসভায় লাখো লাখো চেনামুখ আমি দেখছি। শুধু নেই আমার প্রিয় পিতা বঙ্গবন্ধু, মা আর ভাইয়েরা এবং আরও অনেক প্রিয়জন। ভাই রাসেল আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, আপা বলে ডাকবে না। সব হারিয়ে আজ আপনারাই আমার আপনজন। ... বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তিসংগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য আমি এসেছি। আমি আওয়ামী লীগের নেত্রী হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।' গত চার দশক ধরে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত ও হাজারো প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তিনি জনগণের পাশেই আছেন; ভবিষ্যতে থাকবেনও। ১৯৮৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২০০৭ সালের সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল পর্যন্ত একাধিকবার বন্দি অবস্থায় নিঃসঙ্গ মুহূর্ত কাটাতে হয়েছে তাঁকে।

৫

১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশ ও জনগণের কাছে প্রত্যাবর্তনের মতো শেখ হাসিনার দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনও ছিল আমাদের জন্য মঙ্গলকর। ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারির পর তাঁর দেশে ফেরার ওপর বিধিনিষেধ জারি করে সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তাঁকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ১৬ই জুলাই যৌথবাহিনী তাঁকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে ৩৩১ দিন কারাগারে বন্দি করে রাখে। সেসময় গণমানুষ তাঁর অনুপস্থিতি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। তাঁর সাবজেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের উদ্বেগ, গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে দেশের বিভিন্ন স্থানে চারজনের মৃত্যুবরণ, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের উৎকণ্ঠা আপামর জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেছিল। কারণ সে সময় আদালতের চৌকাঠে শেখ হাসিনা ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা; দেশ ও মানুষের জন্য উৎকণ্ঠিত; বঙ্গবন্ধুকন্যা হিসেবে

সত্যকথা উচ্চারণে বড়ো বেশি সপ্রতিভ। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ধর্ষণ ও লুটপাটের মাধ্যমে এদেশ নরকে পরিণত হয়েছিল। নেত্রীকে গ্রেনেড, বুলেট, বোমায় শেষ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ভীক; এখনও তেমনটাই আছেন। নতুন প্রজন্মকে যথার্থ ইতিহাসের পথ দেখিয়েছেন তিনি নিজের রাজনৈতিক সততার মধ্য দিয়ে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে একাধিকবার শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালের ১৬ই আগস্ট জননেত্রীর ওপর ঢাকায় গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের ১৬ই অক্টোবর তাঁর বাসভবন আক্রান্ত হয়। ১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে একটি বিরাট মিছিল নগরীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে ৪০ জন নিহত হন। ১৯৮৯ সালের ১১ই আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনে থাকাকালে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের সংগঠন ফ্রিডম পার্টির ক্যাডাররা শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়ে। ১৯৯১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনের সময় তাঁর ওপর বন্দুকধারীরা রাসেল স্কোয়ারে আক্রমণ চালায়। ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ট্রেনে ভ্রমণকালে ঈশ্বরদী ও নাটোরে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা জননেত্রীর ওপর গুলিবর্ষণ করেছিল। এভাবেই দেশ-বিদেশে কখনো গোপনে কখনো বা প্রকাশ্যে চলেছে হত্যার ষড়যন্ত্র। ২০০০ সালের ২০শে জুলাই পূর্ব নির্ধারিত জনসভাস্থল কোটালিপাড়া থেকে শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ৭৬ কেজি বিস্ফোরকের বোমা উদ্ধার করা হয়। ২০০৪ সালের ৫ই জুলাই তুরস্ক সফরের সময় জননেত্রীকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট ছিল ভয়াবহতম দিন। অসংখ্য গ্রেনেড নিক্ষেপের পরও নেতা-কর্মীদের মানবঢালের বেষ্টনীর কারণে প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুকন্যা। তবে নিহত হন অনেক আওয়ামী লীগের নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মী। এছাড়া অনলাইন, ব্লগ এবং ফেসবুকে জননেত্রীকে কটাক্ষ করে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে বার বার। হত্যার প্রচেষ্টা ও হুমকির মধ্যেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে শীঘ্রই বিশ্ব সংকটের সীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে– এটা নিশ্চিত। তাই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল অশুভ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে।

৬

মূলত ১৯৮১ সালের ১৭ই মে'র সেকাল আর ২০২৩ সালের একালের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কিন্তু সীমাবদ্ধ কালকে অতিক্রম করে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রেখেছেন সাফল্যের সুদীর্ঘ স্বাক্ষর। তিনি ২০১০ সালে নিউইয়র্ক *টাইমস* সাময়িকীর অনলাইন জরিপে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ১০ নারীর মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে ছিলেন। এছাড়া ২০১১ সালে বিশ্বের সেরা প্রভাবশালী নারী নেতাদের তালিকায় সপ্তম স্থানে, *ফোর্বসের* করা ২০১৬ সালে বিশ্বের ক্ষমতাধর নারীদের তালিকায় ৩৬তম স্থানে ছিলেন। *ফোর্বসের* তালিকায় ২০১৮ সালে ২৬তম এবং ২০১৯ সালে ক্ষমতাধর ১০০ নারীর মধ্যে তিনি ছিলেন ২৯তম। ২০১০ সালের ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবসের শতবর্ষ পদার্পণ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বখ্যাত সংবাদ সংস্থা সিএনএন ক্ষমতাধর ৮ এশীয় নারীর তালিকা প্রকাশ করেছিল। সেই তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে ছিলেন শেখ হাসিনা।

একটানা ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর আরও অনেক অর্জন রয়েছে। যেমন– ২০১৪ সালে সমুদ্রসীমা জয়ের জন্য তিনি সাউথ সাউথ পুরস্কার লাভ করেন, ২০১৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ ৭০তম অধিবেশনে পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' লাভ করেন– এই তালিকা আরও দীর্ঘ। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার লাভ করেছেন। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরিসহ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা, নারীর অধিকার, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধারাবাহিকতা রক্ষায় তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাদৃত। আর বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে তিনি জনগণের কাছে আজ নন্দিত। তাঁর প্রত্যাবর্তন আজও শেষ হয়নি। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে দিয়ে তিনি মহাকালের ইতিহাসে বিশ্রাম নেবেন বলে আমরা মনে করি। এজন্য ১৭ই মে ঐতিহাসিক দিবসে ইয়াফেস ওসমান রচিত 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ১৭ মে ১৯৮১' কবিতাটির একটি অংশ স্মরণ করছি– 'মনে কি পড়ে মনে কি পড়ে/ বেদনার তরী বেয়ে একদিন/ ছুঁয়ে ছিলে স্বদেশের মাটি।/ চারিদিকে নাগিনীর বিষাক্ত নিশ্বাস/ পিতার পতাকা হাতে তবু অবিচল,/ খরস্রোতা নদী হয়ে অবিরাম বয়ে চলা/ মানুষের মুক্তিটা গড়ে দেবে বলে।'

ড. মিল্টন বিশ্বাস: অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশিষ্ট লেখক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, drmiltonbiswas1971@gmail.com

শ্বেতপত্র ১৯৭১-এর মোড়ক উন্মোচন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৫শে এপ্রিল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর পুনর্মুদ্রিত পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ৫ই আগস্ট ১৯৭১ সালে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে *শ্বেতপত্র* ১৯৭১ প্রকাশনাটির মোড়ক উন্মোচন করেন। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া, পরিচালক মোহাম্মদ আলী সরকার প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, যেটি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে, হচ্ছে। বিভ্রান্তি দূর করতেও এই প্রকাশনাটি সহায়ক। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী উদাহরণ দিয়ে বলেন, *শ্বেতপত্রের* তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ব পাকিস্তানের সন্ত্রাস হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ৭ই মার্চ সম্পর্কে লেখা হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার চালাবার কথা ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকটি নির্দেশনা জারি করেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই যে পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল সেটি এখানে পরিস্ফুটিত হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভারত বলত না। সবসময় হিন্দুস্তান বলত। এখানে হিন্দুস্তানের অর্থাৎ ভারতের ভূমিকা নিয়েও একটি অধ্যায় আছে। লেখক, বাগ্মী, সাংবাদিক সবার কাছে বইটি পৌঁছানো প্রয়োজন।

প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন

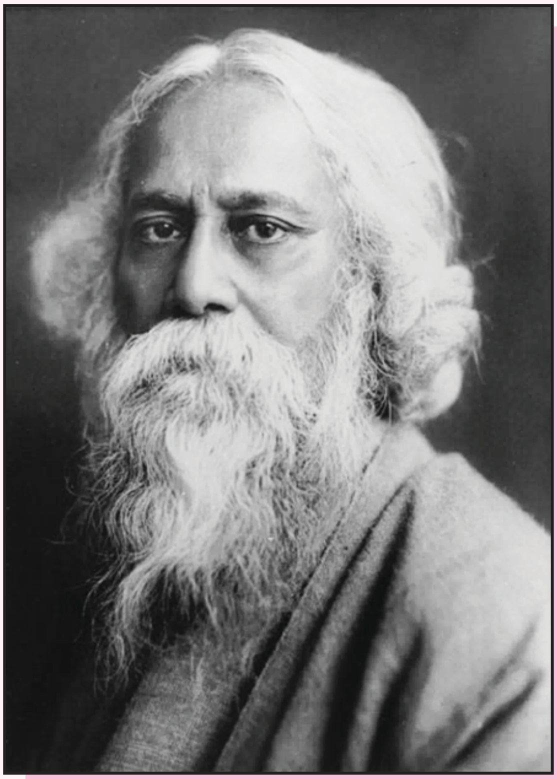

রবীন্দ্রনাথের *কণিকা*

ড. আশরাফ পিন্টু

বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্র প্রতিভার ছাপ পড়েনি। শুধু ছাপই নয়; কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক– বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখাকে তিনি পরিপূর্ণতা দান করেছেন। গদ্যকবিতা লিখে তিনি যেমন কবিতাকে মিত্রাক্ষর (অন্ত্যমিল)-এর বন্ধন থেকে মুক্ত করে আধুনিকতা এনেছেন তেমনি ‘কবিতাকণা’ (২/৪ পঙ্ক্তির কবিতা) লিখে কাব্যজগতে এক অভিনব সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেছেন। এই ‘কবিতাকণা’ বা অণুকবিতাগুলো গ্রন্থিত হয়েছে তাঁর *কণিকা* নামক কাব্যগ্রন্থে, যা রবীন্দ্র সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ ধরনের অণুকবিতাগুলোকে ‘এপিগ্রাম’ বলা হয়। এই এপিগ্রামগুলো সাধারণত সমাধি স্তম্ভের গায়ে খোদিত থাকত। এগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও অর্থগৌরবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে সর্বপ্রথম এই জাতীয় কবিতার উদ্ভব ঘটে। পরে সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃত ও হিন্দি সাহিত্যেও এ ধরনের কবিতা আছে। ফারসি সাহিত্যের ‘রুবাইয়াত’ ও জাপানি ভাষায় লিখিত ‘হাইক’ও এমন ক্ষুদ্রাবয়বের কবিতা। তবে তাৎপর্য বা ভাবগাম্ভীর্যের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের *কণিকা* কাব্যের অণুকবিতাগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

কণিকা কাব্যের প্রথমে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বড়ো কবিতা। এ কবিতাগুলো ৮, ১০, ১২ পঙ্ক্তির। এছাড়া রয়েছে ৬, ৪ ও ২ পঙ্ক্তির অনেক কবিতা। সবগুলো কবিতাকেই নীতিমূলক কবিতা বলা যায়। তবে সবগুলো কবিতাই নীতিমূলক হলেও সরাসরি কোনো নীতিকথা বিবৃতি হয়নি সেখানে। নীতিকথাগুলো প্রকাশ পেয়েছে উপমা আর রূপকের আড়ালে। যেমন–

> কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
> ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।
> হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা–
> কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।
> (কুটুম্বিতা)

এখানে ‘কেরোসিন শিখা’, ‘মাটির প্রদীপ’ এবং ‘চাঁদ’ তিনটি বস্তুই রূপক। মূলত এরা মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের প্রতীক। কেরোসিন শিখার প্রতীকে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মানুষের স্বার্থপরতাই প্রকাশিত হয়েছে উক্ত অণুকবিতাটিতে।

ছোটো অণুকবিতাগুলোর সঙ্গেই কিছু বড়ো পরিসরের (১০/১২ পঙ্ক্তির) কবিতা রয়েছে *কণিকা*তে। এসব কবিতায় কবি প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনা-সংঘাত, ন্যায়-অন্যায়বোধকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন রূপকে–

> লাঙল কাঁদিয়া বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,
> তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা?
> যেদিন আমার সাথে তোর দিল জড়ি
> সেই দিন হতে মোর মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি।
> ফলা কহে, ভালো ভাই, আমি যাই খসে
> দেখি তুমি কী আরামে থাকো ঘরে বসে।
> ফলাখানা টুটে গেল, হলখানা তাই
> খুশি হয়ে পড়ে থাকে কোনো কর্ম নাই।
> চাষা বলে, এ আপদ আর কেন রাখা,
> এরে আজ চলা করে ধরাইব আখা।
> হল বলে, ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে–
> খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে।
> (অকর্মার বিভ্রাট)

অকর্মারা নিজেকে কাজ থেকে বাঁচাতে গিয়ে অনেক সময় ভাগ্যক্রমে নিজেই যাঁতাকলে পড়ে শাস্তি পায়; উক্ত কবিতাটিতে এমন কথাই উন্মোচিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

*কণিকা*তে এমন আরও কিছু (১০/১২ পঙ্ক্তির) কবিতা আছে। যেমন– যথার্থ আপন, অধিকার, নূতন চাল, চুরি নিবারণ, আত্ম-শত্রুতা, দানরিক্ত, স্পষ্টভাষী ইত্যাদি। এর মধ্যে ‘অধিকার’ কবিতাটি নীচে তুলে ধরা হলো–

> অধিকার বেশি কার বনের উপর
> সেই তর্কে বেলা হলো, বাজিল দুপুর।
> বকুল কহিল, শুন বান্ধব-সকল,
> গন্ধে আমি সর্ব বন করেছি দখল।
> পলাশ কহিল শুনি মস্তক নাড়িয়া,
> বর্ণে আমি দিগ্‌-বিদিক রেখেছি কাড়িয়া।
> গোলাপ রাঙিয়া উঠি করিল জবাব,
> গন্ধে ও শোভায় বনে আমারি প্রভাব।
> কচু কহে, গন্ধ শোভা নিয়ে খাও ধুয়ে,
> হেথা আমি অধিকার গাড়িয়াছি ভুঁয়ে।
> মাটির ভিতরে তার দখল প্রচুর
> প্রত্যক্ষ প্রমাণে জিত হইল কচুর।

বিশ্বখ্যাত ছোটো গল্পকার ঈশপের এমন একটি নীতিগল্প

আছে–‘কে বড়’ পেট, না হাত-পা? মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবাই নিজে নিজেকে বড়ো বলে দাবি করে। মহামতি ঈশপ যেমন রূপকের আড়ালে সমাজজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলতে চেয়েছেন, যারা গায়ের জোরে অনেক সময় নিজেকে বড়ো বলে জাহির করতে চায়, অন্যের অবদানকে স্বীকার করতে চায় না, রবীন্দ্রনাথও এ কবিতাটিতে রূপকের আড়ালে এমন সত্যকথাটি বলতে চেয়েছেন।

এবার *কণিকা*র পূর্বের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোটো (৮ পঙ্‌ক্তির) কবিতা ‘ভিক্ষা ও উপার্জন’-এর উদ্ধৃতি দেওয়া যাক–

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা,
কত খোঁড়াখুঁড়ি করে পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস–
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস।
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতি,
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

মানুষের উন্নতির মূলে রয়েছে পরিশ্রম বা শ্রমবৃত্তি। হাত পেতে কিছু নেওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নেই; তা লজ্জারও বটে। শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত ধনের মধ্যেই সত্যিকারের গৌরব নিহিত থাকে।

*কণিকা*র ৬ পঙ্‌ক্তির একটি কবিতার উদাহরণ–

বাবলাশাখারে বলে আম্রশাখা, ভাই,
উনানে পুড়িয়া তুমি কেন হও ছাই?
হায় হায়, সখী! তব ভাগ্য কী কঠোর
বাবলার শাখা বলে, দুঃখ নাহি মোর।
বাঁচিয়া সফল তুমি, ওগো চূতলতা,
নিজেরে করিয়া ভস্ম মোর সফলতা।
(প্রকারভেদ)

বাবলা আর আম্রশাখার রূপকে স্বার্থপর আর পরোপকারী ব্যক্তির কথা প্রকাশ পেয়েছে উক্ত কবিতাটিতে। আমাদের সমাজজীবনে আম্রশাখার সংখ্যায়ই অধিক– রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি বর্তমানে যেন আরও প্রকটরূপ ধারণ করেছে।

*কণিকা*তে অনেকগুলো ৪ পঙ্‌ক্তির কবিতা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ‘এক তরফা হিসাব’, ‘হাতে কলমে’, ‘অল্পজানা ও বেশি জানা’, ‘চালক’, ‘অপরিবর্তনীয়’, ‘স্পষ্টসত্য’, ‘মহতের দুঃখ’, ‘গৃহভেদ’, ‘গরজের আত্মীয়তা’, ‘কুটুম্বিতা’, ‘উদারচরিতানাম’, ‘অসম্ভব ভালো’, ‘প্রত্যক্ষ প্রমাণ’, ‘ভক্তি ভাজন’, ‘মোহ’, ‘কর্তব্যগ্রহণ’, ‘ফুল ও ফল’, ‘মোহের আশঙ্কা’, ‘এক পরিণাম’, ‘প্রশ্নের অতীত’ ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। এই শিরোনামের কবিতাগুলোকে শিরোনামহীন ও অনামী রচয়িতা হিসেবে ছেলেবেলায় আমরা পাঠ্যপুস্তকে সারমর্ম/ভাব-সম্প্রসারণ হিসেবে পড়েছি। আমরা অনেকেই জানি না এ কবিতাগুলোর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। এমন কয়েকটি কবিতা নীচে তুলে ধরছি:

১. মোহ

নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে-
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলই ওপারে।

২. গরজের আত্মীয়তা

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকা থলিরে,
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কি করে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।

৩. উদারচরিতানাম

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই–
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই।

এ কবিতাগুলোতে সমাজজীবনের নানা সমস্যা, স্বার্থপরতা, উদারতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে রূপকের মাধ্যমে। তাৎপর্যপূর্ণ রূপকধর্মী এ অনুকবিতাগুলো দীর্ঘ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

*কণিকা*য় দুই পঙ্‌ক্তিরও অনেকগুলো কবিতা রয়েছে। এ কবিতাগুলোকে অনেকেই প্রবাদবাক্য বলেই জানে। এ দুলাইনের নীতিবাক্যধর্মী রূপক অণুকবিতাগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সমাজের নানা অসঙ্গতি। এগুলো পড়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর জীবনদর্শন ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ দুই পঙ্‌ক্তির কবিতাগুলোতে তাৎপর্যপূর্ণ নামও দিয়েছেন কবি। নীচে কয়েকটি কবিতা তুলে ধরা হলো:

১. ক্ষুদ্রের দম্ভ

শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করে শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

২. সন্দেহের কারণ

কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।
তাইতো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।

৩. একই পথ

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, ‘আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি’?

৪. মাঝারির সতর্কতা

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

৫. শত্রুতা গৌরব

পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোনো ছুতা,
জান না আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা।

রবীন্দ্রনাথের *কণিকা*য় রূপকের আড়ালে যে নীতিকথা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিষয়বস্তু আমাদের সমাজ, সংসার, পরিবার থেকেই গৃহীত হয়েছে। এই দার্শনিকতাপূর্ণ অণুকবিতাগুলো একদিকে যেমন গভীর তাৎপর্যময়, অপরদিকে তা সমাজ ও ব্যক্তি জীবনেও অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এসব কবিতা পড়ে আমরা যেন নতুন করে ধ্যানস্থ হই যা আমাদের চিন্তা-চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

ড. আশরাফ পিন্টু: বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বেড়া, পাবনা, ashrafpintu.sonon@gmail.com

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ

ড. প্রণব কুমার পান্ডে

১৯৮১ সালের ১৭ই মে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা ভারতে ছয় বছর নির্বাসনে থাকার পর বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল বিধায় বাংলাদেশে প্রতিবছর এই দিনটি শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীসহ দেশের আপামর জনগণ এই দিনটিকে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনের লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিকে সমুন্নত রাখতে তিনি সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

প্রথমেই যে বিষয়টি একটু পরিষ্কার করা দরকার তা হলো শেখ হাসিনাকে কেন নির্বাসনে যেতে হয়েছিল? ১৯৭৫ সালে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করার পর যে রাজনৈতিক শক্তি দেশ শাসন করেছিল সেই শক্তি বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যাকে (যাঁরা সেই সময় বিদেশে অবস্থান করছিলেন) দেশে ফিরে আসতে দেয়নি। কারণ সেই শক্তি খুব ভালোভাবেই জানত যে, জাতির পিতার রক্ত যাঁদের শরীরে প্রবহমান, তাঁরা যদি দেশে ফিরে জনগণের সামনে দাঁড়ায় তাহলে দেশের জনগণ জোর করে ক্ষমতা দখল করে থাকা শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। ফলে সেই সময়ের সামরিক একনায়ক শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানাকেও বাংলাদেশে ফিরতে বাধা দিয়েছিল।

ভারতে নির্বাসনে থাকাকালীন সময়ে শেখ হাসিনা আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং দলের কিছু সদস্যের সমর্থন হারানোসহ অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় অবিচল ছিলেন এবং গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকার প্রকাশের মাধ্যমে সমর্থকদের অনুপ্রাণিত করেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দলের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে আওয়ামী লীগের নেতাদের অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ পুনরায় সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হয়নি। দলের মধ্যে নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেয়। এমনকি দলের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বঙ্গবন্ধুকন্যা হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনা সকল পক্ষের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা বীরের মতো বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয় কারণ তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে এসে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন। একইসঙ্গে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে গড়ে তুলতে এবং গণতন্ত্রের দাবিতে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে কাজ শুরু করেন।

তাঁর প্রত্যাবর্তন দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ ও চ্যালেঞ্জিং যাত্রার সূচনা করে। কিন্তু সেই যাত্রাপথ খুব সুখকর ছিল না। নানান ধরনের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা জনগণকে একত্রিত করতে এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সেই সময়ে গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনার অঙ্গীকার তাঁর নেতৃত্বকে মহিমান্বিত করেছিল। একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং সমর্থকদের অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তাঁর আশা ও সংকল্পের বার্তা জনগণের কাছে অনুরণিত হয়েছিল এবং তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

বছরের পর বছর সংগ্রামের পর তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় এবং ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে ব্যর্থ হলেও শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২১ বছর পরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম মেয়াদকালে তিনি জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলেন। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে না পারায় তাঁর কিছু প্রশংসনীয় সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি।

জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ম্যান্ডেটের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফেরার জন্য আবারও দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। সেই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে তিনি সরকার গঠন করেন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি টানা তিনটি নির্বাচনে জয়ী হন। সেই থেকে বদলে যাওয়া বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে যা এখনও চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাবার জন্য এবং বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বছরের পর বছর ক্ষমতায় থেকে তিনি নেতা হিসেবে পরিপক্বতা অর্জন করেন বিধায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর মডেল অন্যান্য দেশের সরকারপ্রধানরা অনুসরণ করছে নিজেদের দেশের উন্নয়ন করার জন্য। টানা তিন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী থেকে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছেন। তাঁর বিভিন্ন অর্জনের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো:

দারিদ্র্য হ্রাস এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন, তা শুধু দেশের দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নেই সহায়ক হয়নি, বরং তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মসূচি এবং কাজের জন্য খাদ্য কর্মসূচিসহ আরও অনেক ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জমির মালিকানাসহ পাকা বাড়ি প্রদানের মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত বাস্তবায়ন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ আশ্রয়ণ প্রকল্পটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শেখ হাসিনা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং বাংলাদেশে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি নীতি বাস্তবায়ন করেন। তিনি শিক্ষার জন্য বাজেট বাড়িয়েছেন, মেয়েদের জন্য সকল স্তরে উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন এবং বিপুল সংখ্যক নতুন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে, নারী অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা একজন শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বাংলাদেশে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বেশ কিছু নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁর সরকারের আমলে। তিনি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা কমানোর লক্ষ্যে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি নতুন মাত্রা পায়। প্রতিবছর প্রায় গড় জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬%-এর অধিক হারে। এই প্রবৃদ্ধির অনেকগুলো কারণের মধ্যে রয়েছে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদন খাতের উন্নয়ন এবং দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার। খরস্রোতা পদ্মা নদীর উপর পদ্মা সেতু নির্মাণ, ঢাকার মেট্রোরেল প্রকল্প এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নের এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে রয়ে যাবে অনাদিকাল। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে শুধু শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের কারণে। তিনি নতুন রাস্তা, সেতু, বিমানবন্দর নির্মাণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেন। তাঁর

সরকার দেশের পাওয়ার গ্রিডের সম্প্রসারণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের প্রসারসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নতির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উদ্যোগও চালু করেন যার সুফল দেশের জনগণ পাচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করার ফলে সরকার জনগণের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। ২০০৬ সালের তুলনায় দেশে কয়েকগুণ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে বর্তমান সময়ে।

সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার উন্নতির লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেন। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে– স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার সম্প্রসারণ, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন এবং জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প চালু। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ অতিমারির তাণ্ডবে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের অর্থনীতি যখন ভেঙে পড়েছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার খুব সফলতার সঙ্গে এই অতিমারি মোকাবিলা করেছে। অতিমারির স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলাসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং বিনামূল্যে সকলের জন্য করোনার টিকা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছেন তিনি। তাঁর সরকারের এই সফলতা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা এবং শাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই উদ্যোগের ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রসার এবং ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তাঁর সরকার সফল হয়েছে। দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর বৈশ্বিক পদক্ষেপের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে একজন শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেন। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে– আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা স্থাপন এবং জলবায়ু, স্মার্ট কৃষির প্রবর্তন। এছাড়া তাঁর সরকার বাংলাদেশে দুর্নীতি হ্রাস, শাসন ব্যবস্থার উন্নতি এবং গণতন্ত্রের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। রাজনৈতিক বিরোধিতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও তিনি একটি সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাঁর নেতৃত্ব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন স্মরণে প্রতিবছর ১৭ই মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়। র‍্যালি, বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। দিনটি বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দিনটি বাংলাদেশের জনগণকে গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর দলের ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের জনগণের জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এবং দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তনে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোরও একটি সুযোগ করে দেয়। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য আশার আলো। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ফলে সামরিক শাসনের অবসান হয়েছে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে এমন একজন নেতা হিসেবে দেখে যিনি সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে পারেন এবং সেই কারণেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটি গণতন্ত্রের জন্য তাঁর সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে পালিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার পর মানুষের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করছেন। তিনি চারবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শাসনামলে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন অর্জন করে এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর নেতৃত্বকে দেখা হয় একটি সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার স্মারক হিসেবে।

ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর, pranabpanday@yahoo.com

মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় চার জাপানি নাগরিককে সম্মাননা

জাপানের রাজধানী টোকিওতে ২৭শে এপ্রিল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন আকাসাকা প্যালেসে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় চার জাপানি নাগরিককে 'ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই দুঃসময়ে যাঁরা বাংলাদেশের পাশে ছিলেন, তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করি, আমরা কখনো আমাদের বন্ধুদের ভুলি না। আমার মনে হয়, বাংলাদেশই বোধ হয় একমাত্র দেশ, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁরা আমাদের পাশে ছিলেন, যাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমি সরকারে আসার পর থেকে তাঁদের খোঁজ করেছি, খুঁজে বের করেছি এবং আমাদের সাধ্যমতো সবাইকে আমরা সম্মান করার চেষ্টা করেছি, সম্মান দিয়েছি।

শেখ হাসিনা বলেন, সেই সময় (১৯৭১) যাঁরা আমাদের পাশে ছিলেন, তাঁদের কখনো আমরা ভুলতে পারি না; তাঁদের অবদান ভুলতে পারি না। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা বাঙালি, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি অনেক রক্তের বিনিময়ে। কিন্তু আমাদের পাশে থেকে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

সম্মাননাপ্রাপ্ত চার জাপানি নাগরিকের অবদানের কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আজ আরও চারজন মহান বন্ধুকে সম্মান জানিয়েছে, যাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের অসহায় মানুষদের জন্য মানবিক, ত্রাণ, চিকিৎসা সুবিধা পাঠিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় এর আগেও সম্মাননা পাওয়া আট জাপানি নাগরিকের কথা স্মরণ করেন তিনি।

প্রতিবেদন: ইশরাত হক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী KISHIDA Fumio-এর উপস্থিতিতে টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দুদেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় –পিআইডি (২৬শে এপ্রিল ২০২৩)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টোকিওতে আকাসাকা প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট জাপানি নাগরিকদের 'Friends of Liberation War Honour' *প্রদান করেন। এসময় তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি (২৭শে এপ্রিল ২০২৩)*

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে বাংলাদেশ-বিশ্বব্যাংকের ৫০ বছরের অংশীদারিত্ব উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এসময় বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট David Malpass উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি (১লা মে ২০২৩)

50
BANGLADESH & WORLD BANK
TOWARDS PROSPE
FOR ALL
A Journey Together
Bangladesh and the World Bank

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট David Malpass-এর উপস্থিতিতে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংক ও ইআরডি-এর মধ্যে ৫টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইআরডি সচিব শরিফা খান এবং বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. আবদৌলায়ে সেক চুক্তি স্বাক্ষর করেন –পিআইডি (১লা মে ২০২৩)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউএস চেম্বার অব কমার্স এবং ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত ‘ইউএস-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সহযোগিতা’ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন (২রা মে ২০২৩)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডনে মার্লবোরো হাউজে কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সরকারপ্রধানদের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন –পিআইডি (৫ই মে ২০২৩)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে লন্ডনের ক্ল্যারিজ হোটেলের সভাকক্ষে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি (৭ই মে ২০২৩)

ইসলামি ঐতিহ্যের রূপকার নজরুল

মো. আবদুল মান্নান

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার জামুরিয়ার চুরুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ও মাতা জাহেদা খাতুন। পারিবারিকভাবেই তাঁরা ইসলামি ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ স্থানীয় মসজিদের ইমাম, মক্তবের শিক্ষকতা ও পীর পালোয়ানের মাজারের খাদেম ছিলেন। চাচা বজলে করিম ফারসি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। ছোটোবেলায় নজরুল আট বছর বয়সে পিতৃহারা হন। আট বছরের নজরুলকে পিতার অবর্তমানে সংসারের হাল ধরতে হয়। নজরুল এমতাবস্থায় স্থানীয় মসজিদের ইমামতি ও মক্তবে শিক্ষকতার কাজ করে সামান্য আয় করে তা দিয়েই সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করেন। এসময়ে তিনি গ্রাম্য লেটো নাট্য দলে যোগ দিয়ে সেখানে কবিয়ালগিরি এবং ছোটো ছোটো নাটিকা লেখেন, অভিনয় করেন। ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে তিনি কিছু গান, ছড়া ইত্যাদি রচনা করেন।

বাংলা-ইংরেজি মিশানো একটি গানের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো–

> রব না আর কৈলাশপুরে
> আই এ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং
> যতসব ইংলিশ ফ্যাশন
> আহা মরি কি লাইটনিং...

ইসলামি ঐতিহ্য তুলে ধরে তিনি অনেক ছড়া, গান, কবিতা রচনা করেন। যেমন–

> চাষ কর দেহ জমিতে
> হবে নানান ফসল এতে
> নামাযে জমিন উগালে...

এক সময় তিনি পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে আসানসোলে একটি রুটির দোকানে কাজ করতেন। সেখানে পুলিশ অফিসার কাজী রফিজ উল্লাহর নজরে তিনি পড়েন। রফিজ উল্লাহ তাঁর পুঁথি পড়া ও অন্যান্য প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের দরিরামপুরের কাজীর সিমলা গ্রামে নিয়ে দরিরাম স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। সেখানে তিনি এক/দেড় বছর পড়ালেখা করে আবার বর্ধমানে ফিরে গিয়ে সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র হিসেবে প্রাকনির্বাচনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এসময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল বাজছিল এবং বাঙালি পল্টনে ব্রিটিশ সরকার সৈনিক ভর্তি করাচ্ছিল। এমনি অবস্থায় নজরুল ম্যাট্রিকুলেশন ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়ে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে ভর্তি হয়ে যান। বাঙালি পল্টনে ভর্তি হয়ে তিনি করাচি সেনানিবাসে চলে যান এবং হাবিলদার পর্যন্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। এখানে তিনি আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষার সাথে আরও বেশি পরিচিত হন। এসময় তিনি পারস্যের কবি হাফিজ, রুমি, ওমর খৈয়ামদের সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন। তিনি গল্প, কবিতা, অনুবাদ ইত্যাদি রচনা করতে থাকেন। তিনি করাচি থেকে প্রথমে 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' নামক একটি গল্প কলকাতার *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় পাঠান। তারপর একটি কবিতা পাঠান যার নাম 'মুক্তি'। আসলে তিনি অনেক লেখাই পাঠিয়েছেন কিন্তু সম্পাদক সাহেব প্রথমে গল্প ও পরে কাবিতাটি ছাপিয়েছেন। সম্পাদকের অমনোনীত সেই লেখাগুলো থাকলে আজ হয়ত আমরা নজরুলের আরও কিছু অমূল্য সম্পদ পেতে পারতাম। এরই ধারাবাহিকতায় যখন ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলো, তখন তিনি কলকাতায় কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের সাথে একত্রে বসবাস করা শুরু করেন। এসময় ঢাকায় নবাব পরিবারের এক ভদ্র মহিলার একটি ক্যাপশনের আলোকে 'খেয়া পারের তরণী' নামক বিখ্যাত কবিতাটি লেখেন। কবিতাটি পত্রিকায় বের হওয়ার সাথে সাথে কবি

মহিতলাল মজুমদার তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। নজরুল মধ্যযুগের মুসলিম পুঁথি সাহিত্য থেকে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে তাঁর কবিতা-গানে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। নজরুলের পূর্বে কোনো মুসলিম কবি-সাহিত্যিক এমনভাবে ফারসি-আরবি শব্দের ব্যবহার করার সাহস পাননি। কবি গোলাম মোস্তফার ভাষায়, নজরুলের পূর্বে আমরা আরবি-ফারসি ভাষা ব্যবহার করার সাহস পাইনি। নজরুলের এই ইসলামি ঐতিহ্যপ্রীতি আমরা তাঁর লেটো দল থেকে নিয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত অটুট দেখতে পাই। ইসলাম তথা কোরান-হাদিসের মর্মবাণী তিনি তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক, উপন্যাস সবকিছুতে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। বিশ্ব সাহিত্যে বিরল নজরুলের সর্ববিখ্যাত ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় দেখুন কোরানের মর্মবাণী কীভাবে ফুটে উঠেছে।

নজরুল বলেন,

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ
ভীম রণ ভূমে রণিবে না

কোরান বলে,

তোমরা সেই পর্যন্ত যুদ্ধ (জিহাদ) কর
যতদিন না ফিতনা-ফ্যাসাদ দূরীভূত না হয়।

অন্য জায়গায় তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন যুদ্ধ (জিহাদ) করছ না? অথচ বৃদ্ধ নরনারী ও শিশু ফরিয়াদ করছে– হে আমাদের রব, আমাদেরকে এই অত্যাচারিত এলাকা থেকে উদ্ধার কর, আমাদের জন্য একজন বন্ধু ও একজন সাহায্যকারী পাঠাও।

দেখুন কোরানের মর্মবাণী কীভাবে ‘বিদ্রোহী’ কবিতাতে ফুটে উঠেছে। নজরুলের ইসলামি ঐতিহ্যবাহী কবিতাসমূহ এক নজরে– খেয়া পারের তরণী, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম, নীল মিয়া আসমান, সুবহে উম্মিদ, উমর ফারুক, খালিদ বিন ওলীদ, আনোয়ার পাশা, কামালপাশা, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ আরও অসংখ্য।

এবার আমরা গানের দিকে মনোনিবেশ দিই। নজরুল বলেন, কবিতায় আমি কী দিয়েছি জানি না, কিন্তু গানে আমি কিছু দিতে পেরেছি। এটা তাঁর আত্মউপলব্ধি। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অজস্র সাহিত্য রেখে গেছেন তাঁর আশি বছরের জীবনে। কিন্তু নজরুল মাত্র ২০/২২ বছর সাহিত্য সাধনা করার সুযোগ পান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আশি বছরে বাইশ/তেইশ শত গান রেখে গেছেন। অথচ নজরুল তাঁর সাহিত্য জীবনে কয়েক হাজার গান রচনা করেছেন। তাঁর বহু গান সংরক্ষণের অভাবে কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। অনেক গান ব্রিটিশ-বেনিয়াদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ বলেন, তিনি পাঁচ হাজার গান রচনা করেছেন, কেউ বলেন সাত হাজার, কেউ বলেন আট হাজার, কেউ বলেন দশ হাজার ইত্যাদি। ইতোমধ্যে নজরুল ইনস্টিটিউট তিন হাজার গানের একটি সংকলন বের করেছে। দেখুন গানে কীভাবে আল্লাহর প্রশংসা করেছেন–

এই সুন্দর ফল এই সুন্দর ফুল
মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবাণী
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ হাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে
পাক-কোরানের বাণী

কী যুক্তি দেখুন! আল্লাহ বলেছেন, আমি যুগে যুগে নবি-রাসুল প্রেরণ করেছি তোমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য। নজরুল সেটা কীভাবে তুলে ধরেছেন।

অন্য জায়গায়– বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে, ঐ নামের গুণেই তরে যাব, কেন এ জ্ঞান দিলে! কী যুক্তির আবদার। উর্দুতে একটা কথা আছে, ‘বান্দে আগার কসুর না করতে, তো ভি এক কসুর থা’– মানুষ ভুল না করলে সেটাও একটা ভুল। কেননা মানুষ ভুল না করলে আল্লাহ কাকে ক্ষমা করবেন। তাহলে আল্লাহর গাফুরুর রাহিম নামের সার্থকতা কী থাকে।

মুসলিম হিসেবে আমরা সবাই জানি, পরকালে মুমিনদের বেহেশতে গিয়েও তৃপ্তি মিটবে না কারণ আল্লাহর দিদার ছাড়া বেহেশতবাসীর মন ভরবে না। এজন্য হজরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) বলেছেন, ‘জান্নাতে দোজখ সে ইয়া রব কিয়া করো, আরজু হ্যায় মাই তুজে দেখা করো।’ (জান্নাত ও দোজখে আমার কিছু যায়-আসে না, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো তুমি মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসবা।)

নজরুলের ভাষায়– আমি তোমায় দেখে হাজারো বার দোজখ যেতে রাজি, সেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার তুমি হবে কাজী।

এবার দেখুন নবি প্রেমিক নজরুলের গান–

আল্লাহ কে যে পাইতে চায়,
হজরতকে ভালবেসে
আরশ কুরচি লওহে কালাম
না চাহিতে পেয়েছে সে।

অর্থাৎ আল্লাহকে পেতে হলে, রাসুল (সা.)কে ভালোবাসতে হবে।

দেখুন কোরানে আল্লাহ কী বলেন, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমার (নবির) আনুগত্য করো।’

রাসুল প্রেমিকের আকুতি দেখুন–

আমি যদি আরব হতাম, মদিনারই পথ, এই পথে মোর চলে
যেতেন, নূর নবী হযরত।

মহানবির জন্ম নিয়ে কী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন দেখুন–

সাহারাতে ফুটলোরে রঙিন গুলে-লা-লা, সেই ফুলেরই
খোশবুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা।

আরও দেখুন–

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয় রে সাগর
আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।

দেখুন আবেগের চরম বহিঃপ্রকাশ–

মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে,
তাই কিরে তোর কণ্ঠেরই গান এমন মধুর লাগে।

আল্লাহ প্রেমিক নজরুলের আবেগ দেখুন–

আমি আল্লাহ নামের বীজ বুনেছি
এবার মনের মাঠে
ফলবে ফসল বেচব তারে কেয়ামতের হাটে।

হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন, আদ দুনিয়ায়ু মজিরাআতুল আখেরা।

দুনিয়া–আখেরাতের ক্ষেত-খামার।

নজরুলকে আমরা বাল্যকাল থেকে লেটো নাট্য দলে তাঁর যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখতে পাই, সেখানে তাঁর গানে-কবিতায় আমরা ইসলামি ঐতিহ্যের যে ছাপ পাই, তা তাঁর পরিণত বয়সেও অব্যাহত ছিল। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে, 'কুল্ল সাইয়্যিন ইলা আছলিহি'– প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ শুরুতে যে মূলের উপর থাকে তা শেষেও বাকি থাকে। যেমন আমরা নজরুলের বেলায়ও তার প্রতিফলন পাই।

নজরুল মহানবির রওজা জিয়ারতে দেখুন কী রকম ব্যাকুল–

কাবার যিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়
আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজীর রওজায়।

কী আকুতি তাঁর গানে ফুটে উঠেছে। অন্যত্র দেখুন–

ওরে ও দরিয়ার মাঝি মোরে নিয়ে যারে মদিনা
তুমি মুর্শিদ হয়ে পথ দেখাও ভাই আমি যে পথ চিনি না।
ওই মদিনা ধুলি মেখে, কাঁদব ইয়া মোহাম্মদ ডেকে ডেকে
কেঁদেছিল কারবালাতে যেমন বিবি সকিনা ।

কী প্রকার অসম্ভব রাসুল প্রেম, যা এর আগে কোনো কবি-সাহিত্যিকের লেখায় ফুটে ওঠেনি।

আরও দেখুন–

মোহাম্মাদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কিরে তোর কণ্ঠেরই গান এমন মধুর লাগে
ওরে গোলাব নিরিবিলি বুঝি নবীর কদম চুমেছিলি
তাই তার কদমের খুশবু আজো তোর আতরে জাগে।

কী রকম বিস্ময়কর কল্পনা হৃদয় নিংড়ানো আবেগ, ভালোবাসা– যা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের অনুরোধে তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য ইসলামি গান লেখা শুরু করেন এবং 'রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ' –এই গানটি রেকর্ড করে আব্বাসউদ্দীন যেমন ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে যান, তেমনি নজরুলের ইসলামি গানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে যায়। যেখানে মুসলিম শিল্পীরা হিন্দু নাম ধারণ করে শ্যামা সংগীত গাইতেন, সেই মুহূর্তে হিন্দু শিল্পীরা মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামি সংগীত রেকর্ড করা শুরু করেন। মুসলিমরা এতদিন গান-বাজনাকে হারাম বলে প্রত্যাখ্যান করে আসছিন, সেখানে নজরুলের হামদ্, নাত, গজল, ইসলামি গান মুসলমানের ঘরে ঘরে এমনকি মিলাদ ও দোয়ার মাহফিলে গাওয়া হতে থাকে। নজরুল ইসলামের মর্মবাণী এসব গানে তুলে ধরেন। মুসলিম জাতিকে তথা ভারতের মুসলিমদেরকে জাগানোর জন্য তিনি মুসলমানদের গৌরবগাথা কবিতা-গানে তুলে ধরেন। তাঁর ইসলামি উদ্দীপনামূলক কবিতা-গানে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে রেনেসাঁ ত্বরান্বিত হয়। তাঁর মহানবির প্রশস্তিমূলক ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম, খেয়া পারের তরণী, কারবালা, কামালপাশা, আনোয়ার পাশা, উমর ফারুক, খালিদ বিন ওলীদ, সুবহে উম্মাদ, এক আল্লাহর জিন্দাবাদ– এসব কবিতা মুসলমানদের মাঝে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি করে। গোলাম মোস্তফার মতে, ইতোপূর্বে মুসলমানদের পুঁথির ভাষা ও আরবি-ফারসি শব্দ নিয়ে কবিতা-গান রচনা করার সাহস কারও ছিল না। নজরুল তাঁর বিশ্বখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতায় মুসলমানি শব্দ সফলভাবে প্রয়োগ করেন। এমন অপূর্ব প্রয়োগ তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ করতে পারেনি। তাঁর ইসলামি গান, ইসলামি মজলিশ, মিলাদ মাহফিলে সাধারণ মুসলমান ও হুজুরদের মুখে মুখে বার বার উচ্চারিত ও গীত হচ্ছে। নজরুল তাঁর এক অভিভাষণে বলেন, আমার সাধনা হচ্ছে, 'ইন্না ছামাতি ওনুসুকি ও মাহইয়া ইয়া ওমামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' অর্থাৎ আমার নামাজ, আমার কুরবানি (আত্মত্যাগ), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু– সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। এটা হজরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া ছিল।

নজরুল তাঁর সাহিত্যে, কবিতা ও গানে কোরান-হাদিসের মর্মবাণী অতি সুন্দভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং আল্লাহ যেন তাঁর এসব কবিতা-গানকে ওছিলা করে তাঁকে পরকালীন মুক্তি দান করেন।

মো. আবদুল মান্নান : সহযোগী অধ্যাপক, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে জাপানি 'মাঙ্গা' ফর্মের কমিক বই

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন নিয়ে রচিত জাপানি চিত্রকলা 'মাঙ্গা' ফর্মের কমিক বই *ফাদার অব দ্য ন্যাশন বঙ্গবন্ধু* আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২৮শে এপ্রিল জাপানের রাজধানী টোকিওর আকাসাকা প্যালেসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর বোন শেখ রেহানার হাতে বইটি তুলে দেওয়া হয়। বইটি তুলে দেন এর লেখক ও প্রকাশক স্কলার্স বাংলাদেশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এম ই চৌধুরী শামীম ও বইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্কলার্স বাংলাদেশের সোসাইটির উপদেষ্টা, ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং বুয়েট গ্র্যাজুয়েটস ক্লাবের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর। এসময় পাঁচ পর্বের বইটির বাকি চার পর্বের প্রকাশ ও প্রকাশনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। ৩০শে এপ্রিল জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের অডিটোরিয়ামে বইটির দ্বিতীয় প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়। এর আগে ৫ই এপ্রিল ঢাকায় বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ও ঢাকায় জাপানের রাষ্ট্রদূত আইওয়ামা কিমিনোরি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস মাঙ্গা ফর্মে তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। বইটিতে বর্ণনা এবং ব্যতিক্রমী ছবির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। জাপানি আর্ট ফর্ম 'মাঙ্গা' চিত্রকলার একটি ব্যতিক্রমী ধারা, যা নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। এর সঙ্গে পাশ্চাত্য ধারা বা অন্য কোনো ফর্মের সম্পৃক্ততাও নেই। জাপানি কমিকের অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ফর্মটি জাপানি চিত্র ও প্রকাশনা শিল্পে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

ফাদার অব দ্য ন্যাশন বঙ্গবন্ধু বইটি মাঙ্গা ফর্মে বাংলা, ইংরেজি এবং জাপানি ভাষায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে চিত্রশিল্পের এই ফর্মটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত হওয়ার প্রয়াস পাবে। সেই সঙ্গে জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন সুপাঠ্য আকারে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবে।

প্রতিবেদন: সোমেন বিশ্বাস

মানুষের অধিকার

মে দিবস

শ্যামল দত্ত

নাম তার ছিল জন হেনরি
ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন
হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিল্পী
খুশি মনে কাজ করে রাত-দিন ...

গণশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথা ও সুরের এই গান আমাদের অনেকেরই পরিচিত। জন হেনরি আমেরিকার লোকগাথার একজন কিংবদন্তি। তিনি ছিলেন আফ্রিকান-আমেরিকান দিনমজুরদের একজন। রেলপথে স্টিল ড্রাইভারের কাজ করতেন। হাতুড়িই ছিল তার কাজের একমাত্র হাতিয়ার। হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে তিনি পাথর ভাঙতেন। লোকগাথায় বলা হয়, জন হেনরি যন্ত্রের সঙ্গে হাতুড়ি হাতে প্রতিযোগিতায় নেমে জিতেছিলেন। জন হেনরি আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় পাহাড়ের সুড়ঙ্গে পাথর কেটে কেটে রেলপথ তৈরির কাজ করতেন। মালিকপক্ষ আধুনিক মেশিন দিয়ে পাহাড় কাটতে চায়। কিন্তু হেনরি জানতেন মালিকরা এই কাজে মেশিন ব্যবহার করলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে, তাদের না খেয়ে মরতে হবে। একজন শ্রমিক নেতা হয়ে হেনরি এটা করতে পারেন না। তাই মেশিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে হেনরি মালিকদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, মেশিনের চেয়ে মানুষই সেরা। মানুষকে কখনও কোনো মেশিন পরাজিত করতে পারে না। হেনরির এমন কথা শুনে শ্বেতাঙ্গ মালিকরা হাসে। তারপর মেশিনের সাথে হেনরির প্রতিযোগিতা শুরু হয়। হেনরি জানে, তার এই প্রতিযোগিতার ওপর হাজার হাজার শ্রমিকের ভাগ্য নির্ভর করছে। এরপর রাত যায় দিন যায়, পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সেই রেল সুড়ঙ্গে হেনরি তার হাতুড়ি নিয়ে কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে হেনরির স্ত্রী মেরি ম্যাক ডেলিন ছুটে আসেন। এদিকে প্রতিযোগিতার সময়ও ফুরিয়ে আসে। মেশিনের সাথে পাল্লা দিয়ে চলে হেনরির কাজ। শেষ পর্যন্ত মানুষের তৈরি স্টিম ড্রিল মানুষের কাছেই পরাজিত হয়। আনন্দ উল্লাসে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার শ্রমিকরা ফেটে পড়ে। হেনরিকে তারা জড়িয়ে ধরতে যায়। কিন্তু ততক্ষণে হেনরি আর বেঁচে নেই। প্রচণ্ড পরিশ্রমের চাপে তার মৃত্যু হয়।

তাই বলা হয়, জন হেনরি নিজের জীবন দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির মাথা উঁচু করে গেছেন। এজন্য শ্রমিক দিবস নিয়ে বাংলা ভাষায় জন হেনরির এই গানটি বেশি জনপ্রিয়–

কালো পাথরে খোদাই জন হেনরি
গ্রানাইট পেশি গড়া ঝলমল
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে পাথরে আগুন ধরে
হাতুড়ি চালানো তার সম্বল।...

‘আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস’ হিসেবে পহেলা মে-র কথা এখন আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বব্যাপী এই দিনটি সবার কাছে পরিচিত। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে সরকারিভাবে এই দিনটি পালিত হয়। অনেক দেশে দিনটি বেসরকারিভাবেও পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই দিবসটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। ফিরে যেতে হবে প্রায় দেড়শো বছরের কাছাকাছি পুরোনো দিনের ইতিহাসের কাছে। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিক আন্দোলন থেকেই মহান মে দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের সূচনা। আমেরিকার শিকাগো শহর ছিল তখন শিল্পায়নের অন্যতম কেন্দ্র। শহরটি ঘিরে অসংখ্য শিল্পকলকারখানা গড়ে উঠেছিল। জীবন-জীবিকার তাগিদে মার্কিন, জার্মান এবং ইউরোপের শ্রমিকরা দলে দলে শিকাগোতে এসে ভিড় জমায়। এর মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল বোধহয় বেশি। শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের মজুরি ছিল খুবই কম। খুব সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যেত। কলকারখানার মালিকরাও এই সুযোগটা লুফে নিয়েছিল। মাত্র এক থেকে দেড় ডলারের বিনিময়ে তারা শ্রমিকদেরকে দিয়ে দিনরাত কাজ করাতো। মালিকদের শর্ত, সপ্তাহের ৬ দিনই শ্রমিকদের কাজ করতে হবে। এর মধ্যে কোনো ছুটি নেই। কারখানা মালিকদের এই কঠোর বিধিনিষেধের হেরফের হলেই শ্রমিকদের ওপর চলত অমানুষিক নির্যাতন। কারও প্রতিবাদে মুখ খোলার উপায় ছিল না। শ্রমিকরা প্রায় যন্ত্রমানব হয়ে উঠেছিল। কষ্ট হলেও তারা মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেত না। কারণ শ্রমিকদের মধ্যে তখনও কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তারা সংঘবদ্ধও হতে শেখেনি তখন। এর মাঝেই কেউ কেউ হয়ত মালিকের কাছে তাদের অধিকারের কথা বলতে গেছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। বরং তাকে কঠিন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকরা কেউই নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট ছিল না। অনেকেই চেয়েছিল তাদের কর্মঘণ্টার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হোক। কেননা কারখানায় কর্মঘণ্টার বাইরেও প্রত্যেকের বিশ্রাম এবং নিজেদের জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। কিন্তু কে শুনবে তাদের কথা?

একটা সময় আসে যখন শ্রমিকরা কিছুতেই এই নির্যাতন আর সহ্য করতে পারছিল না। তখন তারা সংঘবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা করে। আমেরিকার শিকাগো, নিউইয়র্ক, উইসকনসিন এবং বিভিন্ন রাজ্যে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু হতে থাকে। ১৮৮৪ সালের অক্টোবরে আমেরিকার ‘ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস অ্যান্ড লেবার ইউনিয়নস’-এর এক বৈঠকে আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মালিকপক্ষের সঙ্গেও তারা কথা বলে। দাবি মেনে নেওয়ার জন্য ১৮৮৬ সালের পহেলা মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের এই দাবি গ্রাহ্য করেনি। এরপর আমেরিকার বিভিন্ন লেবার ইউনিয়নের সম্মতিতে ১৮৮৬ সালের মে মাসের এক তারিখে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়। শ্রমিকদের দাবি ছিল একটাই, দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ আর নয়। শিকাগোর হে মার্কেটে ধর্মঘটি শ্রমিকদের আন্দোলন

শুরু হলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে শ্রমিকদের হতাহতের ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১৮৮৬ সালের তেসরা মে, শিকাগোর ম্যাককরমিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানির সামনে শ্রমিকরা জড়ো হয়। আন্দোলনরত শ্রমিকদের সেই সমাবেশে আমেরিকান লেবার অ্যাক্টিভিস্ট অগাস্ট ভিনসেন্ট থিওডোর স্পাইস (August Vincent Theodore Spies 1855–1887) যোগ দেন। তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। তিনি শ্রমিকদের একত্রিত হতে এবং তাদের সংগঠনের সাথে দলবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। স্পাইস আরও বলেন, জোটবদ্ধ হওয়া ছাড়া আন্দোলন কখনও সফল হতে পারে না। বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই আন্দোলন চলছিল। আন্দোলনে কোনো ধরনের সহিংসতা ছিল না। কিন্তু দিন শেষে কারখানার কর্মঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠার সাথে সাথে কারখানার দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে অসংখ্য শ্রমিক। তারা দরজার বাইরে অবস্থানরত ধর্মঘটি শ্রমিকদের মুখোমুখি হয়। সেই মুহূর্তে স্পাইস সবাইকে বার বার শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু শ্রমিকদের সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ চড়াও হয়। তারা শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। আবারও হতাহতের ঘটনা ঘটে।

ধর্মঘটি শ্রমিক সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দমনপীড়নে গণ-আন্দোলন কখনও স্তব্ধ হয় না। প্রতিবাদে পরদিন চৌঠা মে আবারও আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন যাতে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্য পুলিশ শ্রমিকদের ঘিরে রাখে। হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকরা তাদের অধিকারের কথা বলতে থাকে। হে মার্কেট চত্বরে হাজার হাজার শ্রমিক সেদিন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। অগাস্ট ভিনসেন্ট থিওডোর স্পাইস সেদিনও শ্রমিকদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেন। তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরপরই সবার অলক্ষে হঠাৎ পুলিশের ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কে বা কারা বোমা নিক্ষেপ করেছে তা জানা না গেলেও বোমার আঘাতে পুলিশের একজন কর্মকর্তা নিহত হন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ পুলিশ আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক প্রাণ হারান। পুলিশ হত্যার দায়ে অগাস্ট স্পাইসসহ আরও আটজন অভিযুক্ত হন। তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরের বছর ১৮৮৭ সালের এগারোই নভেম্বর অগাস্ট স্পাইস এবং অভিযুক্ত অপর ছয়জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। অভিযুক্ত বাকি দুজনের একজন কারাবন্দি অবস্থায় আত্মহত্যা করেন, অন্য একজন অস্কার নিবি (Oscar Neebe)-র ১৫ বছরের কারাদণ্ড হয়।

এ ঘটনার আরও দুবছর পর ১৮৮৯ সালে প্যারিসে ফরাসি বিপ্লবের একশো বছরপূর্তি অনুষ্ঠানে শিকাগো শ্রমিক আন্দোলনের দিনটিকে স্মরণীয় করার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো শ্রমিক আন্দোলনের দিনটি পালন করার প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরে প্রমাণিত হয়, পুলিশের ওপর সেদিন বোমা হামলায় অগাস্ট স্পাইসসহ শাস্তিপ্রাপ্ত কোনো শ্রমিকই দায়ী ছিলেন না। তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও বিচারের রায়ে তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এরপর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়তে থাকে। ১৯০৪ সালে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শ্রমিকদের রোজ আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবি করা হয়।

একইসাথে বিশ্বব্যাপী মে মাসের প্রথম দিন শোভাযাত্রার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আহ্বান জানানো হয়। শ্রমিকরা দিনরাত মিলিয়ে মোট ২৪ ঘণ্টাকে তিনটি পর্বে ভাগ করে নেয়। পর্বগুলো এ রকম : আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম এবং আট ঘণ্টা নিজের জন্য। আমেরিকার সরকার তখনও এই ঘটনার কোনো স্বীকৃতি দেয়নি এবং শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজের দাবিকেও গুরুত্ব দেয়নি। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৬ সালে আমেরিকা আট ঘণ্টা কাজের দাবিকে আইনি স্বীকৃতি দেয়। ১৯১৭ সালে দ্বিতীয় নিকোলাসের (Nikolai II 1868–1918) পতনের পর আমেরিকা সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে ‘দিনে আট কর্মঘণ্টা’র স্বীকৃতি চালু করে। ১৯১৭ সালের পর থেকে সোভিয়েত অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বেশ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা শুরু হয়। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর সোভিয়েত অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশেই মে দিবস আর রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন হয় না। তবে এখনও বিশ্বের ৮০টি দেশে এই দিন সরকারি ছুটি হিসেবে চিহ্নিত। ধীরে ধীরে রাশিয়া, চীন, বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই দিনটির তাৎপর্য ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা পায় শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার দাবি।

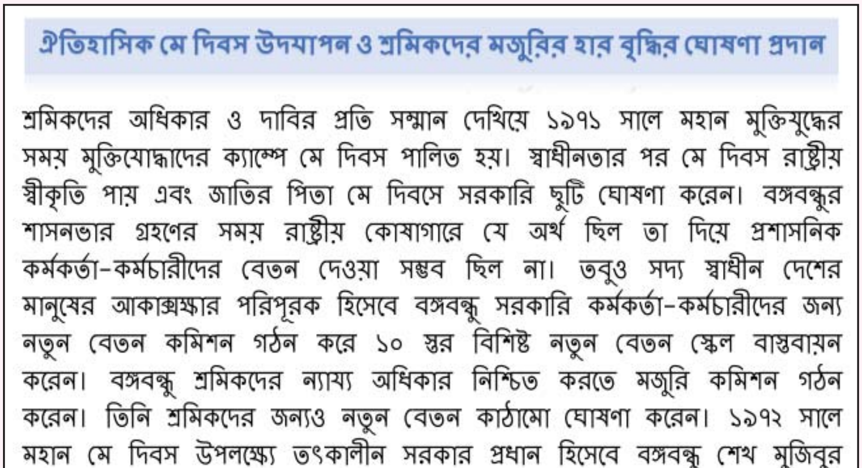

ঐতিহাসিক মে দিবস উদযাপন ও শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধির ঘোষণা প্রদান

শ্রমিকদের অধিকার ও দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মে দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতার পর মে দিবস রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায় এবং জাতির পিতা মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনভার গ্রহণের সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা–কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবুও সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কমিশন গঠন করে ১০ স্তর বিশিষ্ট নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেন। বঙ্গবন্ধু শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে মজুরি কমিশন গঠন করেন। তিনি শ্রমিকদের জন্যও নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালে মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে তৎকালীন সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধি এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের এডহক সাহায্য প্রদানের ঘোষণা দেন।

সূত্র: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সবসময়ই শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কথা বলে থাকে। শ্রমিকদের অধিকার ও দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মে দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতার পর মে দিবস বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭২ সালে মহান মে দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মে দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় মে দিবস। এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য শ্রমিকদের

"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি"
মহান মে দিবস
প্রধান অতিথি : ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি, মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
সভাপতি : বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি"
মহান মে দিবস

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ১লা মে ২০২৩ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহান মে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন। এসময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, যাতে তারা মে দিবসের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে এবং নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বঙ্গবন্ধু সবসময়ই দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক আর অন্যদিকে শোষিত– আমি শোষিতের পক্ষে'। সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত পদস্থ কর্মজীবীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ঐ গরিব কৃষক, আপনার মায়না দেয় ঐ জমির শ্রমিক, আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়, আমি গাড়িতে চলি ঐ টাকায়।' বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে'।

আজও মে দিবসের কথা মনে হলে সেই কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক জন হেনরির কথা মনে পড়ে যায়। সাধারণ শ্রমিককে যাতে কাজ হারাতে না হয় সেজন্য তিনি যন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যন্ত্র কখনও মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। জন হেনরিকে নিয়ে সেই গণসংগীতটি তাই এখনও প্রাসঙ্গিক–

> জন হেনরির হাতুড়ির ঝলকে
> চমকায় বিজলির গতি
> মানুষের সৃষ্টি দুরন্ত স্টিম ড্রিল
> মানুষের কাছে মানে নতি।
> অগ্নিগিরি হলো রুদ্ধ
> থেমে গেল হাতুড়ির শব্দ
> হেনরির জয়গান চারিদিকে উঠে জমে
> হৃদপিণ্ড তার স্তব্ধ।...
> প্রতি মে দিবসের গানে গানে
> নীল আকাশের তলে দূর
> শ্রমিকের জয়গান কান পেতে শোন ঐ
> হেনরির হাতুড়ির সুর।

আসলে মানুষের চেয়ে বড়ো কিছুই হতে পারে না। মানুষের চেষ্টার কাছে সবই সম্ভব। আর এভাবেই শ্রমিকরা জীবন দিয়ে নিজেদের কর্মঘণ্টার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

শ্যামল দত্ত : লেখক, গবেষক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা, dutta209@gmail.com

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে
ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

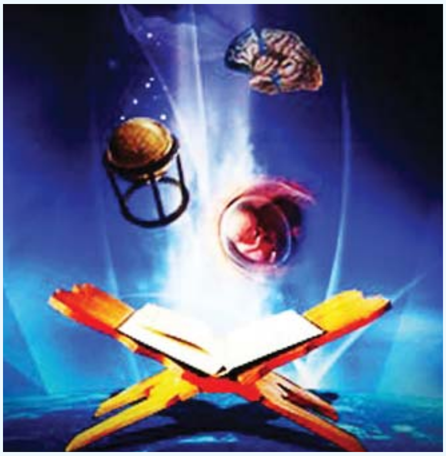

আল্লাহ এবং বিজ্ঞান

ম. মীজানুর রহমান

সমগ্র জীব জগতের সৃষ্টি অদ্যাবধি রহস্যের আবর্তে বিদ্যমান। তবে খোলা মনে ভাবতে তো দোষ নেই যে অণু-পরমাণু সম্পর্কে যে বিজ্ঞান আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, সেই অণু-পরমাণুর সৃষ্টিকর্তা কে? এই ছোট্ট প্রশ্নটাতেই বিজ্ঞানী কাত।

মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে এবং ক্রমান্বয়ে ঘটছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের মনের কথা প্রকাশের আগে কার সাধ্য বলে দিতে পারে। উদ্ভাবিত এবং প্রকাশমান বিজ্ঞানের ভুবন যত প্রসারিতই হোক না কেন আল্লাহর সৃষ্ট অপরিমিত রহস্য উন্মোচন সর্বত্রই দুরূহ।

বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা চলছে, চলবে এবং চলতেই থাকবে কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপরিমেয় রহস্যের কূলকিনারা করা এক রকম অসম্ভব বললে বেশি বলা হয় না। একটি মানুষকে গড়া হয়েছে কত শত শত সহস্র সেল দিয়ে তাই মানুষ গুনতে পারেনি আজ অবধি। তাহলে এই জীবন রহস্যের খেঁই কোথায়? বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার আমরা যা এ পর্যন্ত জানতে পেরেছি তা তুলনামূলকভাবে খুবই নগণ্য।

আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্য উন্মোচনের ক্ষমতা মানুষের সাধ্যের অতলে থাকলেও মানুষ অসাধ্য সাধনের তথা নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্যে তার মেধা কাজে লাগিয়ে চলেছে। তার আবিষ্কারের পরিধিও বেড়ে চলেছে ক্রমান্বয়ে কিন্তু সে কি পেরেছে নিজেকে কিংবা তার মেধার পরিধি আবিষ্কার করতে? মেধা যে আল্লাহ প্রদত্ত। আর যা কিছু আমরা জন্মাবধি দেখছি তার সবই আমিসহ আমাদের অদেখা সেই সৃষ্টিকর্তার।

মানুষের সীমিত জ্ঞান, সীমিত আশা-আকাঙ্ক্ষা আর তা নিয়ে অহংকার করার কিছুই নেই। বিজ্ঞানের বিষয় অঢেল অপরিমেয় যার রহস্য উদ্‌ঘাটন অনিঃশেষ। তবু মানুষ জন্মাবধি আপন অস্তিত্বের দৃঢ়তায় সকল রহস্য আবিষ্কারের আশায় কুহকের পিছে আদিকাল থেকে ছুটে চলেছে। তাতে হয়ত কেউ বিফল হয়েছে, কেউ সফল হয়েছে। আর এই না-পাওয়াকে পাওয়ার অভিযানই হচ্ছে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সাফল্যেই তার টিকে থাকা। মানুষকে টিকে থাকতে হলে চাই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারণ আর তার একমাত্র সহায় সেই অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।

মানুষের চেষ্টার পেছনে যে অদম্য স্পৃহা কাজ করে তাকে বজায় রাখতে হলে তার অনুসন্ধিৎসু মনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সেই উদ্যমের পেছনে যে শক্তি সক্রিয় সেই পরম শক্তি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত। সকল সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটন যখন আমাদের নাগালের বাইরে তখন আমরা অদৃশ্য শক্তির কথা মনে করি এক রকম নিরুপায় হয়ে। আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত।

আত্মানুসন্ধানী কবি টমাস অ্যানসেল (১৯০৭–১৯৮৯) তাঁর পূর্বপুরুষের (অ্যানসেস্টর) সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর উদ্ধৃতি পাঠকের উপলব্ধির জন্য এখানে তুলে দিলাম–

কে বানালো পূর্ব-পুরুষ
গড়লো কে এই দেহ,
করলো আমায় স্বেচ্ছাধীন
কোন প্র-পিতামহ
নাম-গোত্র গেহ ?
মূর্ত-অস্থি সাজিয়ে দিল,
মাংস পিণ্ডে মাজিয়ে দিল
আশ্চর্য এই সত্তা আমার
স্বৈরাচারী মোহ ?
রহস্যময় মন;
বীর্যে প্রতি শুক্রকণা–
আমার তিনি আপনজনা রূপকার কি হন ?
কেউ না কেউ উত্তর এর জানে।
আমাদের কে বলতে পারে
কে জানে এর মানে ?
কার ইচ্ছেয়
মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয় হয়,
কার ইচ্ছেয়
দেহাধারে রক্তধারা বয় ?
(অনুবাদ কবি ম. মীজানুর রহমান)

তাহলে বিজ্ঞানের সীমিত বিষয়-বিশিষ্ট গণ্ডিতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানী তা এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

অতএব অদৃশ্য আল্লাহর অতুল্য বিশ্বাধারে আমরা সবাই অসহায় মানুষমাত্র। তবু আল্লাহর বিশালত্ব থেকে যেসব আবিষ্কার মানুষ তার সীমিত জ্ঞানের আলোর রশ্মিতে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে তা আল্লাহর সৃষ্ট জগতের বিশালত্বের তুলনায় যত নগণ্যই হোক না কেন, তবু মানুষ যে তা থেকে উপকৃত হয়েছে তা-ই আমাদের পরম ভাগ্য বলেই মেনে নিতে হয়। জানি, বিজ্ঞনীরা ভাগ্যকে মানতে রাজি নন কারণ ভাগ্য হচ্ছে রহস্যালোকিত ফল যার আগে-পিছে কোনো গ্যারান্টি নেই। দৃশ্যত অলৌকিক। যেমন আল্লাহকে কেউ দেখেনি তবু সেই অদেখাকে অস্বীকার করারও জো নেই। কারণ দৃশ্যত আমরা আকাশ-পাতাল পর্যন্ত যা দেখে আসছি তা বিস্ময়করভাবেই আমাদের বলে দেয় যে, সেই আশ্চর্যজনক এক ঐশীশক্তিধরকে আমরা না দেখতে পেলেও আমাদের সর্বাঙ্গের অনুভূতিতে টের পাই যে, কে আমাদের এই দুনিয়ায় আনে আবার কোনো এক সময়ের টানে টেনে নিয়ে যায়। সেখানে মানবীয় বিজ্ঞান এখনও পৌঁছায়নি। আর আদৌ পৌঁছাতে পারবে কি না তা বলা যায় না। তবে মানুষের অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসু মনের চোখ অপার্থিবকেও দেখার অদম্য প্রচেষ্টা থেকে বিরত নয়।

ম. মীজানুর রহমান: কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক

মায়ের চেয়ে আপন কেহ নাই

মঈনুল হক চৌধুরী

সত্যি কথা বলতে কী! মায়ের চেয়ে আপন কেউ নেই এই পৃথিবীতে। আর কেউ মায়ের চেয়ে আপন হতেও পারে না। ‘মা’ আমাদের জন্মদাত্রী। ‘মা’ আমাদের প্রিয় বন্ধু। মায়ের চোখেই আমাদের প্রথম পৃথিবী দেখা। আর আমরাও মায়ের নাড়িকাটা ধন। মায়ের মমতা-আদরে বড়ো হই আমরা। তাই পৃথিবীর সব সন্তানের কাছে তার মা সেরা। আমরা তো সবাই জানি, আমাদের প্রিয় মাকে নিয়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটা দিন আছে। সে দিনটিকে তারা ‘মা দিবস’ হিসেবে পালন করে থাকে।

মা দিবসের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, মা দিবস পালন করার রীতি এ যুগের নয়। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেও অনেক জায়গায় এই দিবসটি পালন করত মানুষ। অবাক হওয়ারই কথা। খ্রিষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই মিশর, রোম ও গ্রিসে মা দিবস পালন করা হতো। তবে সে দিবসটা ঠিক আমাদের বর্তমানের মা দিবসের মতো ছিল না। এদিকে ১৬ শতকে ইংল্যান্ডে মা দিবস পালন করা হতো বলে জানা যায়। দিবসটি তারা ‘মাদারিং ডে’ হিসেবে পালন করত। সেদিন সরকারি ছুটিও ছিল। পরিবারের সবাই তাদের মায়ের সাথে দিনটি কাটাতো। তবে এই দিবসটি তখন ততটা প্রসার লাভ করেনি।

ব্রিটিশরা আমেরিকায় তাদের কলোনি স্থাপন করার পর ইংল্যান্ড থেকে দলে দলে মানুষ আমেরিকায় বসবাস করতে শুরু করে। আমেরিকার এইসব নতুন অধিবাসীরা ইংল্যান্ডের ‘মাদারিং ডে’কেও আমেরিকায় আমদানি করে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু নানা কারণে সেটা তারা চালু রাখতে পারেনি। এর প্রায় ১০০ বছর পর ১৮৭০ সালে আমেরিকার জুলিয়া ওয়ার্ড হাও নামের এক গীতিকার মা দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। তিনি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় একটি দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন। সে গানটা সে সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় হাজার মানুষকে হত্যা করা হচ্ছিল কারণে-অকারণে। এক মায়ের সন্তান আরেক মায়ের সন্তানকে হত্যা করছিল অবলীলায়। এসব হত্যাযজ্ঞ দেখে জুলিয়া খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি এটা বন্ধ করার জন্য আমেরিকার সব মাকে একসাথে করতে চেয়েছিলেন। আর এ কারণেই তিনি আন্তর্জাতিক মা দিবস পালন করতে চাচ্ছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল এই দিনটি সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার। তিনি ব্যাপকভাবে সাড়া না পেলেও তার নিজের শহর বোস্টনে দিবসটি পালিত হচ্ছিল বেশ ঘটা করেই। এদিকে ভার্জিনিয়ার একটি নারীদের দল জুলিয়া ওয়ার্ড হাওয়ের প্রস্তাবিত মা দিবসটি পালন করত বেশ মর্যাদার সঙ্গেই। এই দলের নেত্রী ছিলেন অ্যানা রিভেস জারভিস। তিনি গৃহযুদ্ধের সময়কালে ‘মাদারস ফ্রেন্ডশিপ ডে’ পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই দিবস পালনের কারণে গৃহযুদ্ধ সময়কালে অনেকটাই শান্তির বার্তা এনে দিয়েছিল। অ্যানা রিভেস জারভিস তার জীবনের সুদীর্ঘ কুড়ি বছর কাটিয়েছিলেন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্রাফটনের একটি গির্জায়। সেখানে তিনি সানডে স্কুলের শিক্ষকতা করেছেন। তার মৃত্যুর পর তার মেয়ে অ্যানা এম জারভিস মা দিবস ঘোষণা আন্দোলনের হাল ধরেন। অ্যানা জীবিত ও মৃত সব মায়ের প্রতি সম্মান জানানোর তথা শান্তির জন্য এই দিবসটি পালন করতে চাচ্ছিলেন। এই লক্ষ্যে তারা ১৯০৮ সালে গ্রাফটনের ঐ গির্জার সুপারিনটেনডেন্টের কাছে একটি আবেদন জানায়। তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে সে বছরই ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ও পেনসিলভেনিয়ার কয়েকটি গির্জায় মা দিবস পালিত হয়। এভাবে অনেকেই প্রতিবছর মা দিবস পালন করতে শুরু করে। এরপর অনেক পথ পেরিয়ে ১৯১৪ সালে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার জাতীয় মা দিবসের মর্যাদা দেন।

আরও পরে ১৯৬২ সালে এই দিবসটি আন্তর্জাতিক মা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উল্লেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সব কিছুরই আলাদা আলাদা নাম আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক ভাষার সাথে আরেক ভাষার কোনো মিলই নেই। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের শিশুর প্রথম ভাষা ‘মা’। তাই এক কথায় ‘মা’ শব্দটি আসলে কোনো ভাষার নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এই শব্দটি সর্বজনীন। যেমন ফ্রান্সে মাকে বলা হয় মেরি, জার্মানিতে মাটার, হিন্দিতে মাজি, উর্দুতে উমি, ইংরেজিতে মামি, মাম, মামা, মাম্মি, বাংলায় আম্মা, মা। তাই ভালোমতো খেয়াল করলে দেখা যায় ‘মা’ শব্দটি কী খুব বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করছে, অবশ্যই না। মা দিবস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পালন করা হয়। শুধু কী তাই, দেশ ভেদে এই বিশেষ দিবস পালনের রীতিও ভিন্ন ভিন্ন। কালের বিবর্তনে ধীরে ধীরে সারা বিশ্বের দেশে দেশে মা দিবস পালনের রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মা দিবস পালন করা হয়।

মানুষের জীবনে মায়ের অবদান পরিমাপ করা কঠিন। তাই মা দিবসটিও পালন করতে হবে সুন্দর ও অর্থপূর্ণভাবে। মায়ের কাছে নিঃসংকোচে সকল আবদার করা যায়, কেননা মা সবসময় চিন্তা করেন কীভাবে সন্তানের মঙ্গল করা যায়। মা যেন কষ্ট না পায় সেজন্য আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। আর তাই কোনো নির্দিষ্ট দিনেই নয় মাকে আমরা ভালোবাসবো প্রতিদিন-প্রতিক্ষণ।

মঈনুল হক চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

তথ্য অধিকার আইন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

সেলিনা আকতার

বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের ইতিহাসে তথ্য অধিকার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২০০৮ সালের ২০শে অক্টোবর তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি হয়। ২০০৯ সালের ২৯শে মার্চ জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। রাষ্ট্রপতি ৫ই এপ্রিল এ আইনে সম্মতি প্রদান করে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ই এপ্রিল ২০০৯ আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১লা জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে আইনটি সারা দেশে পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়। তথ্য অধিকার আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করে দেখা যায় ১৭৭৬ সালে সুইডেনে সর্বপ্রথম তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়। এর ১২২ বছর পর ১৮৮৮ সালে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে কলম্বিয়া, ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ১৩টি দেশে এ আইন প্রণীত হয় এবং নব্বইয়ের দশকে মোট ১৯টি দেশে এবং ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ১২৯টি দেশে এই আইন প্রণীত হয়।

বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সেই তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য জানা জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জনগণের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ আইনে প্রত্যেক নাগরিক বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এই আইনে বাংলাদেশের যে-কোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত যে-কোনো সংস্থাসমূহের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি এই আইনকে তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত অন্য সব আইনের উর্ধ্বে অবস্থান দেওয়া হয়েছে এবং আইনের প্রস্তাবনায় এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন– দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে এবং কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেপ্তার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

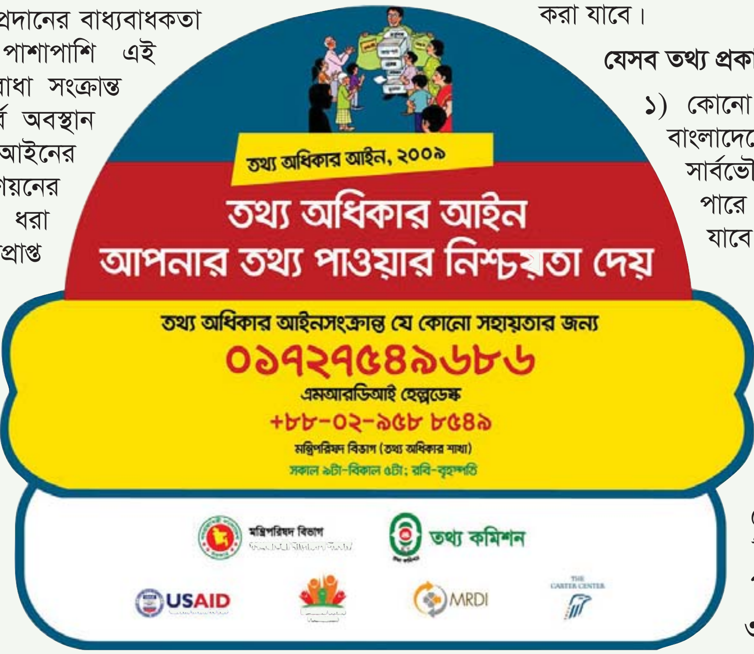
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার আইন
আপনার তথ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়

তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত যে কোনো সহায়তার জন্য
০১৭২৭৫৪৯৬৮৬
এমআরডিআই হেল্পডেস্ক
+৮৮-০২-৯৫৮ ৮৫৪৯
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (তথ্য অধিকার শাখা)
সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা; রবি-বৃহস্পতি

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
তথ্য কমিশন
USAID
MRDI
THE CARTER CENTER

এ আইনে তথ্য প্রদানের সব বাধা অপসারণ করা হয়েছে। আইনের মাধ্যমে প্রথমত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অতঃপর আপিল কর্মকর্তা, সর্বশেষ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি রাখা হয়েছে। তথ্য চেয়ে না পাওয়ার কারণে দায়ী ব্যক্তিকে জরিমানা, ক্ষতি পূরণের আদেশ করে বিভাগীয় মামলা রজ্জুর সুপারিশ করার বিধান রাখা হয়েছে। তাই তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এটি একটি অসাধারণ পদক্ষেপ যা আইনকে শক্তিশালী করেছে।

তথ্য অধিকার আইন আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে। মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত, যাকে একটি আইনগত অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তথ্যের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং যেসব অধিকারের প্রতি জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার সবগুলো যাচাইয়ের একটি পরশপাথর মর্মে উল্লেখ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। মূলত আন্তর্জাতিকভাবে তথ্য পাওয়ার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

যেসব তথ্য দেওয়া যাবে

কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সকল নিয়মকানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল প্রকাশনা ইত্যাদির তথ্য প্রদান করা যাবে। এছাড়া যে সকল শর্তে লাইসেন্স পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা পেতে পারে তার তথ্য প্রদান করা যাবে।

যেসব তথ্য প্রকাশ করা যাবে না

১) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এমন কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না;

২) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

৩) কোনো তথ্য প্রকাশের

ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এইরূপ তথ্য;

৪) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য।

তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ঘটানো, সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, দুর্নীতি প্রতিহত করা, সর্বোপরি রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি যাতে জনগণের স্বার্থে কাজ করে তা নিশ্চিত করা। এ আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের সকল ইউনিটে তথ্যের জন্য জনগণের আবেদন এবং চাহিত তথ্য প্রদান বা আইন ও বিধিমালা অনুসারে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রয়েছে। সেই মোতাবেক সারা দেশেই সকল কর্তৃপক্ষ এই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের সকল জনগণের এ বিষয়ে ধারণা থাকে না বলে তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। নিম্নে স্থানীয় পর্যায়ের কয়েকটি তথ্য প্রদান করা কর্তৃপক্ষের তালিকা উপস্থাপন করা হলো:

স্বাস্থ্য	ইউনিয়ন ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিক, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, সূর্যের হাসি বা সবুজ ছাতা চিহ্নিত ক্লিনিক
শিক্ষা	উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিস, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলা তথ্য অফিস, উপবৃত্তি প্রকল্প ও গণশিক্ষা বিভাগ
কৃষি	স্থানীয় কৃষি অফিস, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, ব্লক সুপারভাইজার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
আইন	গ্রাম আদালত, থানা পারিবারিক আদালত, জেলা আইন সহায়তা কেন্দ্র, জেলা জজের আদালত
ভূমি	ইউনিয়ন তহশিলদার অফিস, থানা ভূমি অফিস, রেজিস্ট্রি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কার্যালয়
নারী উন্নয়ন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, নারী উন্নয়নমূলক সংস্থা, ব্র্যাক
স্থানীয় প্রশাসন	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন
ঋণ	কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি
মৎস্য	উপজেলা মৎস্য অফিস
পরিবেশ	স্থানীয় বন বিভাগ কার্যালয়
দুর্যোগ	জেলা ত্রাণ অফিস, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, রেড ক্রিসেন্ট অফিস
কর্মসংস্থান	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
পয়ঃনিষ্কাশন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
উন্নয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা তথ্য অফিস, জেলা ও উপজেলা পরিষদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এনজিও (যেমন–ব্র্যাক, আশা, আরডিআরএস, টিএমএসএস ইত্যাদি)

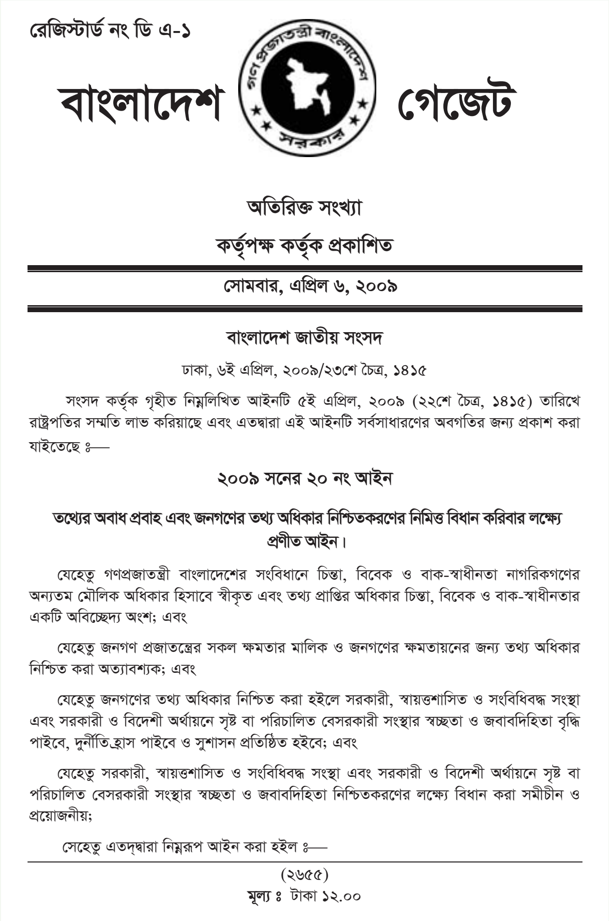

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০০৯ (২২শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ২০ নং আইন

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং

যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

(২৬৫৫)
মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

উপরের উদাহরণগুলো ছাড়াও তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও আছে:

- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসমূহ অর্থাৎ জাতীয় সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি;
- সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ, বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন ইত্যাদি;
- কোনো আইনের অধীনে গঠিত হয়েছে এমন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যেমন– দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, গ্রামীণ ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি;
- সরকারি কাজ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যেমন– বিভিন্ন সেতুর টোল আদায়কারী সংস্থা, রেলওয়ের বিভিন্ন সার্ভিস পরিচালনাকারী সংস্থা ইত্যাদি।

এভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা ও অবিশ্বাস দূর করে জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে এবং সেবা-দাতা ও সেবা-গ্রহীতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সেলিনা আকতার: উপপরিচালক (প্রশাসন), ডিএফপি, ঢাকা, ddadmin@dfp.gov.bd

উচ্চ ফলনশীল জাত 'বঙ্গবন্ধু' ধানের ফলনে কৃষকের মুখে হাসি

কাজী মোতাহার রহমান

জানুয়ারিতে দফায় দফায় শৈত্যপ্রবাহ, এপ্রিলজুড়ে দাবদাহ আর কালবৈশাখির ঝাপটার মধ্যেও দক্ষিণের পাঁচ জেলায় বোরোর বঙ্গবন্ধু জাতের ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জাতের এবারের ফলনে কৃষকের মুখে হাসির ঝিলিক ফুটেছে। অন্য জাতের ধানের তুলনায় এ জাতের ধানে হেক্টরপ্রতি গড়ে দুই মেট্রিক টন ফলন বেশি হয়েছে। উল্লিখিত পাঁচ জেলায় এবার ৫০ কোটি টাকা মূল্যের বঙ্গবন্ধু জাতের ধান উৎপাদন হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট 'ব্রি বঙ্গবন্ধু-১০০' জাতের ধান অবমুক্ত করে। পরীক্ষামূলকভাবে গত বছর খুলনায় একশো হেক্টর, বাগেরহাটে সাত হেক্টর, যশোরে ১৩ হেক্টর এবং গোপালগঞ্জে দুইশো হেক্টর জমিতে আবাদ হয়।

প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বোরো উৎপাদন কর্মসূচি
বাস্তবায়নে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডুমুরিয়া, খুলনা।

ফটোফিচার: মো. ইনসাদ ইবনে আমিন

কৃষি অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত নতুন এ জাতটি উফশী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এতে রোগবালাই কম। গত বছরের তুলনায় এবারে ধানের কদর বেড়েছে। এবার খুলনা জেলায় ২২৮ হেক্টর, যশোরে ৩ হাজার ৩৩ হেক্টর, বাগেরহাটে ১৬০ হেক্টর, সাতক্ষীরায় ৭৪১ হেক্টর এবং গোপালগঞ্জ জেলায় ৪৬৫ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে। এবছরে আবাদকৃত ধানের মধ্যে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ২৬ হেক্টর, মোকছেদপুর উপজেলায় ৩৫ হেক্টর, কাশিয়ানী উপজেলায় ১৮ হেক্টর, কোটালীপাড়ায় ১৯০ হেক্টর এবং টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১৯৬ হেক্টর। যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ৭৪৫ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে।

এবার খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় ১০৫ হেক্টর, দিঘলিয়া উপজেলায় ৭৫ হেক্টর, রূপসা উপজেলায় ২৭ হেক্টর, বটিয়াঘাটা উপজেলায় পাঁচ হেক্টর, তেরখাদা, পাইকগাছা উপজেলা ও মহানগরী এলাকায় ১৩ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে।

ডুমুরিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ইনসাদ ইবনে আমিন জানান, মাগুরখালী, শোভনা, আটলিয়া, খর্ণিয়া, ধামালিয়া ও গুটুদিয়া ইউনিয়নে এ জাতের ধানের কদর বেড়েছে। হাইব্রিডের মতো ফলন হচ্ছে। প্রতি হেক্টরে সাড়ে আট মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে।

রূপসা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফরিদুজ্জামান বলেন, রূপসার ইলাইপুর, ঘাটভোগ, পদ্মবিল, সামান্তসেনা বিলে এই ধান চাষ করা হয়। রূপসায় হেক্টর প্রতি এবছর সাড়ে ছয় মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। এটা জিংক সমৃদ্ধ ধান। নোনা আবহাওয়া সহ্য করতে পারে না।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার উপ-পরিচালক কাজী জাহাঙ্গীর হোসেনের ভাষ্যমতে, এ জাতের প্রতি কেজি চালে ২৫ দশমিক ৭ মিলিগ্রাম দস্তা রয়েছে। ফলে খাদ্যে দস্তার অভাব পূরণ করবে। খুলনার তিন উপজেলায় এ জাতের ধানের কদর বেড়েছে। আগামীতে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী। রোগবালাই কম হওয়ায় কৃষক এদিকে ঝুঁকে পড়েছে। জেলার নয় উপজেলায় প্রদর্শনী খামারে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাগেরহাটের উপ-পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, গত বারের চেয়ে এ মৌসুমে এ জাতের ধানের আবাদ অনেক বেড়েছে। এ জেলায় এবারে ১৬০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হয়েছে। এখানে এবছর হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন হয়েছে ৬ দশমিক ৮ মেট্রিক টন। গত বছর ৭ হেক্টর জমিতে পরীক্ষামূলক চাষ করা হয়।

বোরো মৌসুমের একটি জাত বঙ্গবন্ধু একশো। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর গবেষণা মাঠে পাঁচ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ২০১৯ সালে মাঠ পর্যায়ে কৃষকের কাছে আবাদের জন্য পাঠানো হয়। ২০২০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড এ জাতের বীজের অনুমোদন দেয়। মূলত এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে– প্রতি কেজি চালে ২৫ দশমিক ৭ মিলিগ্রাম জিংক, প্রোটিন ৭ দশমিক ৮ শতাংশ, অ্যামাইলোজ ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ। চাল মাঝারি, চিকন ও সাদা। এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন ১৬ দশমিক ৭ গ্রাম। গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে আকার-আকৃতি ব্রি ধান-৭৪-এর মতো। প্রতি হেক্টরে ফলন ৭ দশমিক ৭ মেট্রিক টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ফলন ৮ দশমিক ৮। জীবনকাল ১৪৮ দিন। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত ধানের চেয়ে কম হয়।

কাজী মোতাহার রহমান: প্রাবন্ধিক ও সংবাদকর্মী, খুলনা

কবিতার মানুষ খালেদা এদিব চৌধুরী

রহিমা আক্তার মৌ

ষাটের দশকের বাংলাদেশি একজন লেখিকা, অন্যতম প্রধান কবি ও কথাশিল্পী হলেন খালেদা এদিব চৌধুরী। ১৯৩৯ সালের ৩রা জুলাই কুমিল্লা জেলার পয়ালগাছা গ্রামের জমিদার চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর বাবা মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ছিলেন উদার প্রকৃতির, সাহিত্যানুরাগী, শিক্ষানুরাগী ও সংগীতপ্রিয় খাঁটি বাঙালি। মায়ের নাম মেন্দিয়া খাতুন চৌধুরী। কবি হিসেবে খ্যাতিমান হলেও তিনি গল্পকার, ঔপন্যাসিক, শিশু সাহিত্যিক ও অনুবাদক হিসেবেও সমধিক পরিচিত। ১৯৫৮ সালে তিনি টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজ থেকে স্নাতক, পরে শিক্ষায় স্নাতক লাভ করেন ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে। এরপর ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

খালেদা এদিব চৌধুরী কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষকতা দিয়ে। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। এরপর তিনি তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন। দীর্ঘকাল তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কিশোর পত্রিকা *নবারুণ*। পরবর্তীতে তিনি কিশোর পত্রিকা মাসিক *নবারুণ* ও *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার সিনিয়র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা *অতলান্তিক* সম্পাদনা করেন। সর্বশেষে তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। একাধারে তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা, একজন শিক্ষক, একজন সাংবাদিক এবং একজন লেখিকা হিসেবে কাজ করেন।

খালেদা এদিব চৌধুরী সরকারি চাকরির পাশাপাশি লেখালেখি করেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, শিশু সাহিত্যসহ সাহিত্যের সব শাখায় ছিল তাঁর পদচারণা। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম গল্পগ্রন্থ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, শিশু সাহিত্যসহ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৩টি। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো:

কাব্যগ্রন্থ: *আমার দাহ আমার হাত* (১৯৭৮), *পান্থ তোমার ভালোবাসা* (১৯৮৩), *পাথরে আগুন* (১৯৮৫), *তোমার অনঙ্গ* (১৯৮৬), *দুহাতে আঁধার কেটে* (১৯৯৩), *হে বাঁধন লতার কাঁদন* (১৯৯৫), *দুফোঁটা চোখের জল* (১৯৯৭)।

গল্পগ্রন্থ: *জনমনিষ্যির গল্প* (১৯৮২), *পোড়ামাটির গন্ধ* (১৯৮৫), *অন্য এক নির্বাসন* (১৯৭৬)।

উপন্যাস: *অনন্ত মধ্যাহ্ন রাত* (১৯৮০), *হে প্রেম হে সময়* (১৯৯৭)।

শিশু-কিশোর গল্প-উপন্যাস: *অন্তর বন্ধু* (১৯৮১), *বুবুর জন্যে সারা দুপুর* (১৯৮৩), *অরণ্যের ক্যানভাস* (১৯৮৬), *শীতের দিনরাত্রি* (১৯৮৭), *তোমার পতাকা যারে দাও* (১৯৮৮), *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প* (১৯৯৩), *সেই পাখি নেই* (১৯৯৬)।

কিশোর অনুবাদ: *স্পার্টাকাস* (১৯৯৬), *জিম করবেট ও মানুষ খেকো চিতা* (১৯৯২), *মা* (১৯৯১)।

সাহিত্য সমালোচনা: *জীবনানন্দ দাশ: ঝরাপালক-এর কবি* (১৯৮৬)।

সাহিত্যে অবদানের জন্যে খালেদা এদিব চৌধুরী বিভিন্ন পুরস্কার পান। ১৯৯৩ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া কবিতালাপ সাহিত্য পুরস্কার পান ১৯৮৮ সালে। আলাওল সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৯ সালে, কবি জসীমউদদীন সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৯ সালে, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার ১৯৯১ সালে, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার, এম নুরুল কাদের ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার, ঢাকা মহিলা ক্লাব পদক, উশি সাহিত্য পুরস্কার (কুমিল্লা) পান তিনি।

ইপিআইডিসির সাবেক অর্থ পরিচালক আনোয়ারুল হকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। আনোয়ারুল হকের পৈত্রিক নিবাস ছিল নোয়াখালীর চৌমুহনীতে। খালেদা এদিব চৌধুরী তিন সন্তানের জননী। ইঞ্জিনিয়ার তানভীরুল হক প্রবাল হলেন তাঁর ছেলে। এক মেয়ে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও অঙ্কনশিল্পী সুমনা হক, অন্য মেয়ে সংগীতা খান। ২০০৮ সালের ২৮শে মে ইন্তেকাল করেন এই সদালাপী কবি।

এক সাক্ষাৎকারে তাঁর মেয়ে সুমনা হক শিল্পীজীবনে কার অনুপ্রেরণা বেশি পেয়েছেন? –এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাবা-মা আমার সকল প্রেরণার উৎস। ছবি আঁকার জগতে প্রবেশ করেছিলাম বাবার হাত ধরে। খুব উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিতেন সেই ছোট্টবেলা থেকে। বাবা আবার খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। তাঁর সেই সংগীতপ্রিয়তা মনে হয় আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। আজ সংগীত ভুবনের একজন প্রতিনিধি হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে পারছি। এতে বাবা-মায়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

শিল্প-সাহিত্যের সব অঙ্গনে তাঁর অবাধ বিচরণ হলেও তিনি কবি হিসেবেই খ্যাতিমান। তাঁর বৈচিত্র্যময় কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ। ঝড়ের আগে ও পরে প্রকৃতির যে পরিবর্তন

সেটাই তুলে ধরেছেন কবি এ কবিতায়–

> পৃথিবীটা কান্নায় ভরে আছে শুধু যুদ্ধ, হুংকার, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা
> ঝড়ের তাণ্ডবে আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে
> আমি যে এগোতে পারি না আর …

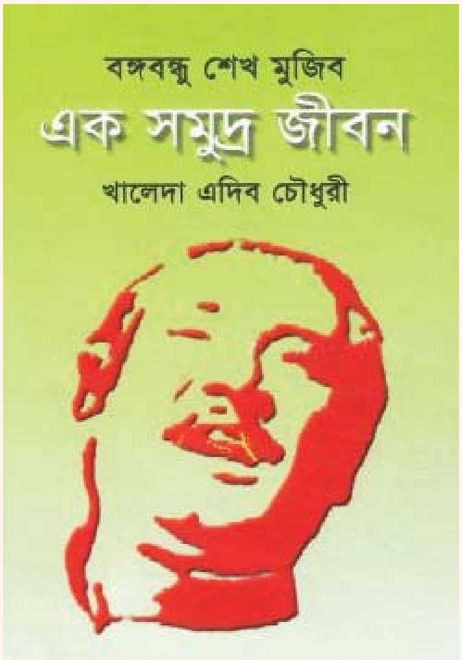

একটা স্তব্ধ সময়ের প্রকাশে কবি নিজের ব্যর্থতার কথা বুঝিয়েছেন সামনে না যাওয়া দিয়ে। ‘বাতাসের ভেতরে যে বিষাক্ত মিথাইল আছে তাকে বিনষ্ট করবে কে ?’ আসলে কি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা আছে এই মিথাইলকে শেষ করার, যদি না আমাদের প্রকৃতি না সাজে সবুজ অপরূপে। সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদীদের আক্রমণে আমাদের চারপাশ, এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন তিনি এই কবিতার ভাষায়।

প্রতিটি মানুষের জীবনে কোনো না কোনো সময় শূন্যতা আসে, এই শূন্যতা নিজেকে নতুন করে চিনাতে পারে, নিজেকে নতুন রূপে সাজাতে পারে। তবে এই একাকিত্বের বেদনা অনেক মর্মান্তিকও হয়। ‘শূন্যতা গিলে খায়, নিষ্ঠুর নিয়তি, এই সব দেখে দেখে ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়।’ কবির কথায় প্রকাশ পেয়েছে বাস্তবতা। কষ্ট বা আনন্দ, বেদনা বা বিরহ কিন্তু সময় ঠিক ফুরিয়ে যায় তার নিয়মেই। ‘যেমন ফুরিয়ে যায় চুরি করা সময়, চোরের মতো পা টিপে টিপে প্রহর প্রস্থান করে, জানি কোনোদিন বাজবে না সাজঘরে নূপুর নিক্কন।’ অসাধারণ কথার মিলনে বাস্তবতার কথা, যেন সব মানুষের জীবনের সঙ্গে তিনি ছিলেন খুবই পরিচিত। একদিন সবাইকেই বিলীন হয়ে যেতে হবে তবুও বেঁচে থাকা সময়টুকুতে ভালো থাকার জন্যে কত কত চেষ্টা আর লড়াই। কেউ হারতে হারতে জিতে যায় আর কেউ জিততে জিততে জেতার আনন্দ পায়, ভুলেই যায় হেরে যাওয়ার মাঝেও আনন্দ আছে।

খালেদা এদিব চৌধুরী যে শুধু ব্যক্তি, প্রকৃতি বা সবুজ বনায়ন নিয়েই কবিতা লিখেছেন তা নয়। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামে আমরা হারিয়েছি অসংখ্য ভাইবোনকে। তাঁদের নিয়েও তিনি লিখেছেন। একাত্তরে নিহত শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তিনি গোলাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ‘গোলাপের কোনো মৃত্যু নেই’ নামের কবিতায় তিনি লিখেছেন– ‘তোমরা ফুল হয়ে গেলে। ওরা বুঝলো না পৃথিবীতে গোলাপের কোনো মৃত্যু নেই।’ ঠিক বলেছেন তিনি। স্বাধীনতার পঞ্চাশ পেরিয়েছে এইভাবে শতবছর চলে যাবে, স্বাধীনতা সংগ্রামে হারিয়ে যাওয়া ফুলদের আমরা কখনই ভুলবো না।

> এসো ভালোবাসা গায়ে মেখে দিই, তোমাদের মহৎ
> মৃত্যুর মতো আর কোনো মৃত্যু আছে কী? জীবনতো
> এতটা গভীর, এতটা শিল্পের সমান প্রদীপ
> শিখার মতো জ্বলে ওঠে কী?

আহা! কী মমতা মাখানো কবিতার চরণ, যেন মমতাময়ী মা ডাকছে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের। জীবনের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা ছোটো ছোটো বিষয়গুলো আমাদের বড়ো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে শিখায়, ধৈর্য ধরতে সাহায্য করে, সেটাই হলো আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।

এক একটা কবিতায় ভিন্ন ভিন্নভাবে আবিষ্কার করা যায় কবি খালেদা এদিব চৌধুরীকে। ‘আমার দাহ আমার হাত’ কবিতায় তিনি জীবনের অনেক দিককে তুলে ধরেছেন। নিজেকে তুলনা করেছেন কঠিন পাথরের সঙ্গে আবার নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন বটবৃক্ষের সঙ্গে। স্বপ্নকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন দাউ দাউ করা আগুনে।

> একটি ছুটির ভোর তাড়া করে ফেরে এখনও
> এখনও কামিনীর ডালে ফোটে ফুল
> টুংটাং শব্দ ভেসে আসে
> আমাকে ইথারে স্পর্শ করে কোনো স্বর
> আমাকেও বুঝি ভুলে যেতে হয় সুগভীর আলিঙ্গন

‘মহাকালের ধ্বনি’ কবিতায় তিনি একটি ছুটির ভোরের অপেক্ষায় থেকেছেন, সেই ভোরে যেন তাঁকে ভুল না বুঝে সেটাও বলে দিয়েছেন। খালেদা এদিব চৌধুরী যেন কবিতার জন্যেই কলম হাতে নিয়েছিলেন। আবার বলতে হয় কলম হাতে নিয়েছেন বলেই নিজেকে তুলে ধরেছেন কবিতায়।

রহিমা আক্তার মৌ: কলামিস্ট, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক, rbabygolpo710@gmail.com

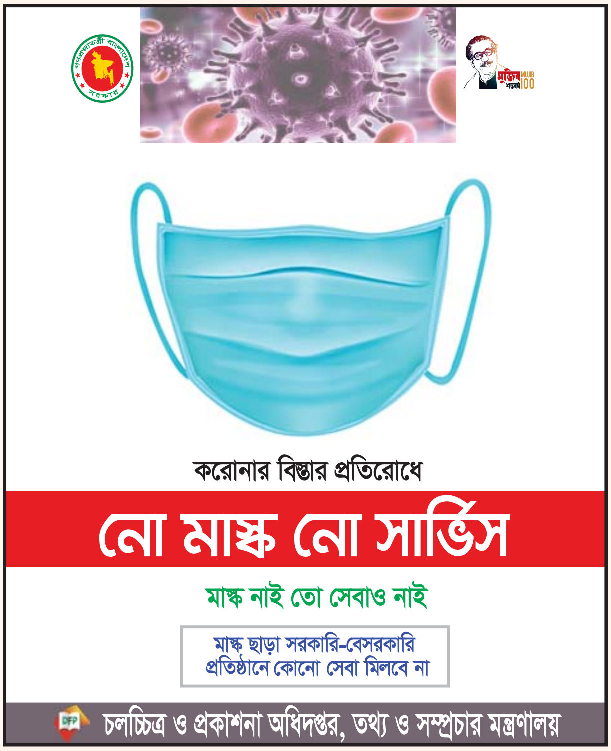
করোনার বিস্তার প্রতিরোধে
নো মাস্ক নো সার্ভিস
মাস্ক নাই তো সেবাও নাই
মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বজ্রপাতঃ প্রয়োজন সচেতনতা

মাহমুদা শিউলী আক্তার

প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর মধ্যে বজ্রপাত খুব পরিচিত, রহস্যময় এবং একই সাথে আতঙ্কের। সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রার প্রায় সমান মাত্রার স্ফুলিঙ্গ আর ভয়াবহ গর্জন বহুকাল ধরেই মানুষের পিলে চমকানোর কাজটি দায়িত্বের সাথে পালন করে আসছে। বজ্রপাতের সৌন্দর্যের এই ভয়ালরূপের পাশাপাশি আমাদের মনে রহস্যের জন্ম দেয় বজ্রপাত হওয়ার কারণ সম্পর্কে।

জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হওয়ার সময় তাতে প্রচুর স্থির বৈদ্যুতিক চার্জ জমা হয়। মেঘ কীভাবে চার্জিত হয় তা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে বেশ মতভেদ থাকলেও সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হচ্ছে– পানিচক্রে জলকণা যখন ক্রমশ উর্ধ্বাকাশে উঠতে থাকে তখন তারা মেঘের নীচের দিকের বেশি ঘনীভূত বৃষ্টি বা তুষার কণার সাথে সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়। ঝড় এসময় মেঘ বা জলীয়বাষ্প বা ঘনবায়ু প্রচণ্ড বেগে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে প্লাজমা অবস্থার তৈরি হয়। যার ফলে উপরের দিকে উঠতে থাকা অনেক বাষ্প পরমাণু বেশকিছু ইলেকট্রন হারায়। যে পরমাণু ইলেকট্রন হারায় তা পজিটিভ চার্জে এবং যে পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে তা নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হয়। অপেক্ষাকৃত হালকা পজিটিভ চার্জ চলে যায় মেঘের উপর পৃষ্ঠে যার প্রবাহকে পজিটিভ বজ্র বলে এবং ভারী নেগেটিভ চার্জ জমা হয় মেঘের নীচে বা মাঝামাঝি অবস্থানে যার প্রবাহকে নেগেটিভ বজ্র বলে। বজ্রপাতের অধিকাংশই হলো নেগেটিভ বজ্রপাত যাতে কারেন্ট থাকে ২০-২৫ হাজার অ্যাম্পিয়ার এবং ভোল্টেজ থাকে ৩০ হাজার থেকে কয়েক লাখ ভোল্ট। অন্যদিকে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো পজিটিভ বজ্রপাত অর্থাৎ জমাকৃত বিপুল পরিমাণ পজিটিভ চার্জ (মেঘের উপরে) সরাসরি ভূমিতে এসে ভূমির গভীরে চলে যায় বা গ্রাউন্ড থেকে ইলেকট্রন-এর প্রবাহ উল্টোপথে উঠে অর্থাৎ উপরে গিয়ে একে নিউট্রালাইজ করে। মোট CG বজ্রপাতের ৫% হলো এ ধরনের পজিটিভ বজ্রপাত যাতে ভোল্টেজ থাকে ১০০ কোটি ভোল্ট এবং কারেন্ট থাকে ৩ লক্ষ অ্যাম্পিয়ার। মজার ব্যাপার হলো, এটি কখনো বৃষ্টির মধ্যে হয় না বরং বৃষ্টি ছাড়া ঝড়ো আবহাওয়াতে হয়। অর্থাৎ একে বলা যায় বিনা মেঘে বজ্রপাত। সাধারণত, পাওয়ার সাবস্টেশন নষ্ট হওয়া বা বনজঙ্গলে আগুন লাগার অন্যতম প্রধান কারণ এই পজিটিভ বজ্রপাত।

বজ্রপাতের ক্ষেত্রে আলো কোনো বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে আসে না। বজ্রই আলো উৎপাদন করে তার সেই আলো সোজা আমাদের চোখে এসে পড়ে। আমরা তখন বাজের ঝলক দেখতে পাই। অন্যদিকে শব্দ তরঙ্গ মানুষের কানের ভেতর গিয়ে ঢুকে মস্তিষ্কের এক বিশেষ পর্দায় আঘাত হানে। তখন মস্তিষ্কের সেই পর্দায় কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পনকেই আমরা শব্দ হিসেবে শুনি। আলোর বেগ শব্দের বেগের প্রায় নয় লক্ষগুণ। বজ্রপাতে আলো আমরা তাৎক্ষণিক দেখি এবং সৃষ্ট শব্দ শুনতে প্রায় ৯ সেকেন্ড সময় লাগে।

বাংলাদেশে বজ্রপাত নিয়ে গবেষণা করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ ফারুখ। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের বজ্রপাতের মূল কারণ দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। বাংলাদেশের এক দিকে

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ
সবুজ-প্রতিবেশ
আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ
বজ্রপাতের ঝুঁকি মোকাবেলায় ও জন সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী কর্তৃক
তালের চারা রোপণ কর্মসূচি-২০২২
প্রধান অতিথিঃ জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ কিরন, মাননীয় সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-৩, বেগমগঞ্জ।
বিশেষ অতিথিঃ জনাব শামসুন নাহার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
সভাপতিঃ জনাব মোঃ ফরিদ মিঞা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী।
রাস্তার নামঃ এমপি সড়ক, নাজিরপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
আয়োজনেঃ বেগমগঞ্জ এসএফপিসি, উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী।

বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড

বঙ্গোপসাগর, এর পরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় রয়েছে; সেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুইটি বাতাসের সংমিশ্রণ বজ্রপাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে।’ তিনি বলেন, ‘দেশের আয়তন হিসেবে বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি।’ এর কারণ হিসেবে তিনি সচেতনতার অভাবকেই দায়ী করেছেন। আবহাওয়াবিদদের পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত প্রবণ। তারা বলেন, বজ্রপাতের ঘটনা বেশি ঘটে হাওর অঞ্চলে। কেননা এসব অঞ্চলে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে। সে হিসেবে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট এবং সেই সাথে টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহকে বজ্রপাতের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল।

সেভ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড থান্ডারস্টর্ম অ্যাওয়ারনেস ফোরামের গবেষণা সেলের প্রধান আব্দুল আলীম জানান, বজ্রপাত বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ দুইটি। (১) বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া এবং (২) বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে মাঠের উঁচু গাছ কেটে ফেলা। তার মতে এখন প্রয়োজন হলো ফাঁকা জায়গাগুলোতে আশ্রয়কেন্দ্র এবং টাওয়ার স্থাপন করা। টাওয়ারের উপরে লাইটিনিং প্রটেকশন সিস্টেম বসাতে হবে। অল্প সময়ে সহজ পদ্ধতি হলো বজ্র নিরোধক দণ্ড। বাংলাদেশের সুনামগঞ্জে ২৪টি বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। তবে এর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন বলে দাবি করছেন স্থানীয়রা।

বাংলাদেশের জাতীয় দুর্যোগের তালিকায় ২০১৬ সালের ১৭ই মে বজ্রপাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, মার্চ থেকে মে মাসে বজ্রপাত হয় ৫৯ শতাংশ, জুন থেকে সেপ্টেম্বরে ৩৬ শতাংশ এবং ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল, মে ও জুনে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ২০১১ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৭ বছরে বাংলাদেশে বজ্রপাতে ১৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। বার্ষিক প্রাণহানির এই সংখ্যার বিচারে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম।

অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর গবেষণা চালিয়েছে। তারা বলেছে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয় যার ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল থেকে জুন মাসে। ২০১৩ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বজ্রপাতে মারা গেছে ১৮৭৮ জন এবং তাদের ৭২ শতাংশই কৃষক।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ৩০১ জনের, ২০১৮ সালে ৩৫৯ জন, ২০১৯ সালে ১৬৮ জন, ২০২০ সালে ২৩৬ জন, ২০২১ সালে ৩৬৩ জন এবং ২০২২ সালে মারা গেছেন ২৭৪ জন।

বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানোর লক্ষ্যে দেশবাসীকে আগাম সতর্কবার্তা দিতে দেশের ৮টি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বজ্রপাত চিহ্নিতকরণ যন্ত্র বা লাইটিনিং ডিটেকটিভ সেন্সর বসিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যন্ত্রপাতি কেনায় খরচ হয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা।

বজ্রপাতের আঘাতে মানুষের শরীর পুড়ে যায়। অনেক সময় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। শকওয়েভ সাউন্ড বা প্রচণ্ড শব্দের কারণে মানুষ পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে, নার্ভ সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও নানান ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা, স্মৃতিভ্রম ইত্যাদি। গবেষক ড. আশরাফ দেওয়ান বলেন, কেউ বৈদ্যুতিক শক পেলে আমরা যেমন তাকে চিকিৎসা দেই সেরকম চিকিৎসা সাথে সাথে দেওয়া গেলে বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকেও বাঁচানো সম্ভব।

বন্যা এবং সাইক্লোনের মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তুতি নেবার সুযোগ থাকলেও বজ্রপাতের বিষয়টি অনেকটা ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক। বজ্রপাত থেকে বাঁচতে আমাদের যা যা করণীয় সেগুলো হলো: (১) বজ্রপাতের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ না করা, (২) খোলা স্থানে অবস্থান না করা, (৩) গাছের নীচে অবস্থান না করে গাছ থেকে চার মিটার দূরে অবস্থান করা, (৪) বৈদ্যুতিক খুঁটি বা তারের নীচ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে, (৫) ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগ লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে, (৬) যতদ্রুত সম্ভব দালানের নীচে অবস্থান করতে হবে, (৭) বাড়িতে অবস্থানকালে জানালা বা বারান্দার কাছে অবস্থান না করা, (৮) অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে যাওয়া, (৯) প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে, (১০) নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকা, (১১) বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নীচু করে বসতে হবে, (১২) গাড়িতে অবস্থান করলে গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটানো যাবে না, (১৩) মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নীচে অবস্থান করতে হবে।

সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ উন্নত দেশসমূহের মতো সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস পেতে রাডারের সাথে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি উন্নয়ন করতে হবে।

মাহমুদা শিউলী আক্তার: গবেষণা কর্মকর্তা, ডিএফপি, ঢাকা

শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক

মো. বেলায়েত হোসেন

পহেলা মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' পালিত হয়। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেট প্রাঙ্গণের ম্যাসাকারে নিহত শহিদ শ্রমিকদের স্মরণে রেমন্ড লাভিনের প্রস্তাবে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' পালন শুরু হয়। হে মার্কেট প্রাঙ্গণের রক্তাক্ত আন্দোলন, প্রতিবাদের বারুদ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। এ প্রতিবাদ শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের শরীর থেকে ঝরে পড়া মূল্যহীন ঘামের। ১৮৮৪ সাল থেকে ২০২৩ সাল। এর মাঝে শ্রমিকদের আন্দোলন, সংগ্রাম, সফলতা, ব্যর্থতার মূল্যায়ন আছে প্রতিটি শ্রমিকের অন্তরে।

মহান মে দিবস
২০২৩
সফল হোক
"শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি"
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কর্মচারী

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ১লা মে ২০২৩ ঢাকায় মহান মে দিবসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি উদ্বোধন করেন -পিআইডি

সেই ঘটনার ১৩৮ বছর পরেও, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে শ্রম বিষয়ক আইনকানুন থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিনই শ্রমিকদের অমানবিক মৃত্যু, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার খবর পাওয়া যায় বিশ্বব্যাপী। এক্ষেত্রে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলো শ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এগিয়ে থাকলেও বিপর্যস্ত অবস্থা উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোতে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৮ সালে ফেডারেল আইনের মাধ্যমে ন্যায্য শ্রম মান আইন (FLSA) প্রণয়ন করে। এফএলএসএ-এর অধীনে শিশুশ্রমের বিধানগুলো তরুণদের শিক্ষাগত সুযোগগুলো সুরক্ষিত করার জন্য এবং তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর চাকরিতে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন, শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, ২০১৮ সালের পর দেশটিতে শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘন ৭০ শতাংশ বেড়েছে। গত অর্থবছরে ৮৩৫টি কোম্পানি এই আইন লঙ্ঘন করে (সূত্র: বার্তা সংস্থা রয়টার্স এবং ডয়েচে ভেলে)। অন্যদিকে, আরেক উন্নত রাষ্ট্র চীন ১৯৯৫ সালে শ্রম আইন, ২০০৮ সালে শ্রম চুক্তি আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করেছে। তবে কোথাও কোথাও বাস্তবায়নে ব্যত্যয়ও ঘটেছে।

প্রত্যেক কর্মজীবীই এক এক জন শ্রমিক। শ্রমের ধরন হতে পারে ভিন্ন। শ্রমিক দিয়ে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করানো এবং সঠিক পারিশ্রমিক যেমন শ্রমিকের অধিকার, ঠিক তেমনি এটা মালিকপক্ষের দায়িত্ব। শিশু শ্রমিকের প্রতি রূঢ় আচরণের চিত্রও দেখা যায়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৩৪নং ধারায় শিশু-কিশোর নিয়োগের বিধিনিষেধ রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধারা ৬১-৭৮-এ শিল্পকারখানা বা কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। আমাদের শ্রম আইনের সঠিক বাস্তবায়নে সকল মালিকপক্ষের আন্তরিক হওয়ার বিকল্প নেই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অপরিহার্য। শ্রমিকের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শ্রমিকের শ্রম ঘণ্টা, শ্রমের সঠিক মূল্য দেওয়ার মানসিকতা হোক শতভাগ। এভাবেই মহান মে দিবসের অঙ্গীকারের বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বের প্রতিটি শ্রমিকের জীবনে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস সার্থক হোক সচেতনতায়, সফল হোক আন্তরিকতায়।

মো. বেলায়েত হোসেন: সহকারী তথ্য অফিসার, রামগড়, aio.ramgarh@gmail.com

নিরাপদ মাতৃত্ব রক্ষায় সরকারের পদক্ষেপ

তানজিনা চৌধুরী

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২৮শে মে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালিত হয়। দিবসটি সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য দিবস' হিসেবেও পালিত হয়। বাংলাদেশে এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে ১৯৯৭ সাল থেকে যথাযথ মর্যাদায় নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়ে আসছে। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো– নিরাপদ মাতৃত্বকে নারীর অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে মা ও নবজাতকের মৃত্যু হার কমিয়ে আনা। সুস্থ মা, সুস্থ সন্তান নিরাপদ মাতৃত্বের ফসল ও সুস্থ জাতি গঠনে অপরিহার্য।

একজন নারীর পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। সন্তানকে পৃথিবীতে আসার সূচনা থেকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত সুন্দর-সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেন গর্ভধারিণী মা। পৃথিবীর সর্ববহুল উচ্চারিত সর্বোত্তম শ্রুতিমধুর একটি অক্ষরের একটি শব্দ 'মা'। মা হলেন–জননী, জন্মদাত্রী, স্তন্যদায়ী এবং পালনকর্ত্রী। এই শব্দের মাঝে লুকিয়ে আছে জগতের শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, অকৃত্রিম ও অতুলনীয় ভালোবাসা। নিজের সুখ হারাম করে সন্তানকে মানুষ করার সার্বক্ষণিক চেষ্টা থাকে মায়েদের। সন্তানের নিরাপদ জন্ম ও সুস্থ জীবন নির্ভর করে মায়ের সুস্থতার ওপর। নিরাপদ স্বাস্থ্য মায়ের অধিকার। প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর সময়ে একজন মায়ের জন্য লুকিয়ে থাকে মৃত্যুঝুঁকিসহ নানা আশঙ্কা। গর্ভবতী নারী সেবা পাওয়ার সব অধিকার রাখেন। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মা এবং নবজাতকের অবস্থা থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। এ সময় মায়ের জীবন নিরাপদ রাখাই হচ্ছে নিরাপদ মাতৃত্ব। সুন্দর জীবন ও সুস্থ-সবল নবজাতকের জন্য নিরাপদ মাতৃত্বের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে গর্ভধারণের ৪২ দিন থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত দুর্ঘটনা ছাড়া মায়ের মৃত্যুকে মাতৃমৃত্যু বলা হয়। মৃত্যুর পরোক্ষ কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যানসার, স্থূলতা, যক্ষ্মা, রক্তস্বল্পতা, হেপাটাইটিস বি, ২০ বছরের কম বা ৩৫ বছরের বেশি বয়সে সন্তান নেওয়া, এইচআইভি এইডস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি। ইউএনএফপি-এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত এক সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে প্রসব জনিত ফিস্টুলায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৬৯ জন। আর এ ফিস্টুলার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হলো– জরুরি প্রসূতি সেবাপ্রাপ্তি ও দক্ষ ধাত্রীর অভাব। মাতৃস্বাস্থ্য এবং নবজাতকের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)-এর অন্যতম একটি অংশ ছিল। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ সফল। ২০০৫ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতি লাখে ২৩৩ জন, ২০১৪-তে সেই হার ১৯৪ জন। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যু কমিয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০ জন।

শেখ হাসিনার সরকার নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। যেমন: মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীতকরণ এবং সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে 'ডে কেয়ার সেন্টার' স্থাপন করা। বর্তমানে ১৮ হাজার পাঁচশো কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা এবং ৪৬ প্রকার ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে ৩.৪৮ থেকে ১.৭২ এবং শিশুমৃত্যুর হার ৪১ থেকে ২৪ জনে নামিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রসবকালীন সেবা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিডওয়াইফ প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। সারা দেশে আধুনিক কল সেন্টার 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' চালু করা হয়েছে। মোবাইল ফোনে ও অনলাইনে চিকিৎসা সেবা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আরও উন্নত করা হয়েছে। এ কল সেন্টারের ১৬২৬৩ নম্বরে ফোনে কল করে যে কেউই ২৪ ঘণ্টা তাৎক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে, অ্যাম্বুলেন্স স্বাস্থ্য সেবার ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে পারেন। তিন হাজার ১৩১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ২ হাজার ২০০টিতে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা নিরাপদ প্রসব সেবা চালু করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নতুন করে মোট ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৪টি শয্যা স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে বাবার নামের পাশাপাশি পাসপোর্টসহ সকল ক্ষেত্রে মায়ের নাম অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপ শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি–যা দেশে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করছে।

দেশে নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, পরিবেশ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের মডেল হিসেবে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০১০ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের এমডিজি পুরস্কার দেয়। রূপকল্প–২০২১ ও রূপকল্প–২০৪১-এর মাধ্যমে সরকার দেশকে এমন এক জায়গায় নিতে চায়, যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল নাগরিক উন্নয়ন জীবন উপভোগ করতে পারবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসে আমাদের চাওয়া–সবার মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, তবেই নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে। সব শ্রেণির নারী এই অধিকার পাবে, তবেই নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন করা সার্থক হবে।

তানজিনা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বিশ্ব মুক্ত
গণমাধ্যম
দিবস

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস এবং বাংলাদেশ

শারমিন ইসলাম

সংবাদপত্রের সম্পাদনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সংবাদকর্মীদের মেধা, মনন ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রকে বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। একটি সংবাদ একজনের প্রয়োজন মেটায়, সমাজের অসংগতি দূর করে, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করে। অর্থাৎ অজানাকে জানার মানুষের যে চাহিদা, তা মেটায়। একটি সংবাদপত্রে তথা গণমাধ্যমে দেশ ও জাতির সকল বিষয়ের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মৌলিক আদর্শগুলো চিহ্নিত করে ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত আফ্রিকার নামিবিয়ায় উইন্ডোহয়েক শহরে ইউনেসকো ও ইউএনডিপিআই-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ডিক্লারেশন অব উইন্ডোহয়েক ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩রা মে 'বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবস' বা 'বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়। এ বছর বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সকল প্রকার মানবাধিকারের চালিকাশক্তি'। সাংবাদিকতার স্বাধীনতা তথা মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ, বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মূল্যায়ন, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার শপথ গ্রহণ এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ক্ষতিগ্রস্ত ও জীবনদানকারী সাংবাদিকদের স্মরণ ও তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এই বিশেষ দিবসটিতে।

সংবাদপত্রকে আবার একটি রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভও বলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কোনো দেশ গণতান্ত্রিকভাবে কতটুকু শক্তিশালী, তা পরিমাপে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোর মধ্যে সংবাদমাধ্যম একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, যে দেশের সংবাদমাধ্যম যত বেশি স্বাধীন ও সার্বভৌম, সে দেশের গণতন্ত্র তত বেশি শক্তিশালী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সংবাদপত্র সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে। স্বাধীন সংবাদমাধ্যম গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য সহায়ক। যে দেশে স্বাধীন সংবাদপত্র নেই, মিডিয়া নেই, সে দেশকে কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক বলা যাবে না। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হলে গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারে না, মুখ থুবরে পড়ে। তাই গণতন্ত্র ও সংবাদমাধ্যম পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধান নিয়ে আমরা গর্ব করি। সংবিধানের ৩৯নং ধারাটি একজন সংবাদকর্মীকে যেমন তার মতপ্রকাশের অধিকার দিয়েছে, ঠিক তেমনি একইসঙ্গে সংবাদপত্রকেও অনুমতি দিয়েছে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হওয়ার। সংবাদকর্মী তথা সংবাদপত্রের জন্য এ ধারাটি একটি রক্ষাকবচ।

বর্তমান সরকারের সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ২০১৪ সালে সংবাদপত্রকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, যা সংবাদপত্র জগতে একটি মাইলফলক। এর আগে দেশের সংবাদপত্রগুলো

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
জনস্বার্থে সাংবাদিকতা
সাংবাদিকতায় নিরাপত্তা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত সাংবাদিক সংগঠন বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব, গভঃ রেজিঃ নং-৯৮৭৩৬/১২
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বস্তরের সাংবাদিক জাগো...
বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষে-
৩ মে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে
মানববন্ধন
স্থানঃ সাতমাথা, বগুড়া।
আয়োজনেঃ বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব, বগুড়া জেলা শাখা
বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৩
আলোচনা সভা
(ওয়াইজেএফবি),
জেলা শাখা।

মুদ্রণশিল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হতো। পাকিস্তান আমলে আমাদের গণমাধ্যম ছিল হাতে-গোনা। তখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না বলে সাংবাদিকদের নানা কৌশল অবলম্বন করতে হতো সংবাদ পরিবেশনে, যেন মানুষ সঠিক তথ্য পায়। স্বাধীনতার পর মতপ্রকাশের সাংবিধানিক স্বাধীনতা পায় সাংবাদিকরা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার পর সংবাদমাধ্যম বন্দি হয়ে যায় সামরিক শাসনের অধীনে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তখন ছিল না বললেই চলে। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি থেকে আশির দশক পর্যন্ত সংবাদ পরিবেশনায় ছিল নানা সেন্সরশিপ। পরবর্তীতে নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পর মুক্তি পায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা তথা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। বিকশিত হতে থাকে গণমাধ্যম।

২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুযায়ী জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, গণমাধ্যমের সহায়তা, জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, গণমাধ্যম শিল্পের মানোন্নয়ন, সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন, বিকাশ ও সংরক্ষণ এবং গণমাধ্যমকর্মীর পেশাগত দক্ষতা ও সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার গণমাধ্যম কর্মী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছে। ১৪ বছর আগে বাংলাদেশে দৈনিক পত্রিকা ছিল মাত্র ৪৫০টি, তা এখন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ১২৬০টি। অনলাইন গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। টেলিভিশনের সংখ্যা ১০টি থেকে এখন ৩৬টি অনএয়ারে আছে। এফএম রেডিও লাইসেন্স প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে পেয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ কিংবা পাশ্চাত্যেও এত বেশি সংবাদমাধ্যম বিকাশ লাভ করেনি। সংবাদমাধ্যম এবং সংবাদকর্মীদের জন্য বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে চলেছে। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই আইনের অধীনে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের ওয়েজ বোর্ড হয়ে আসছিল। ১৯৭৪ সালের এই আইনটি সাংবাদিকতা পেশাকে বিশেষ মর্যাদা দেয়।

গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ বা এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথের পাশাপাশি অনেক চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে। শুরু হয়েছে সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ দেওয়ার প্রতিযোগিতা। এটি করতে গিয়ে এমন অনেক সংবাদ পরিবেশিত হয় যা সঠিক নয় এবং বিভ্রান্তিকর। অনলাইনের ক্ষেত্রে এটি বেশি লক্ষ করা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন, সংবাদপত্র বা যে-কোনো গণমাধ্যম শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য সংবাদ প্রচার করে না, এটি মানুষের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়। সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার যেদিকে দৃষ্টিপাত করছে না, সেদিকে দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে। গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি আমাদের সবার সম্মিলিতভাবে দায়িত্বশীল হতে হবে। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

বিডার ওএসএস পোর্টালে ৪টি নতুন সেবা

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালে নতুনভাবে যুক্ত হলো চারটি সেবা। ৯ই মে ২০২৩ বিডার কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত বিডার অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেমে নতুন চারটি সেবা সংযুক্তির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) লোকমান হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার, Waiver of Condition 7 প্রদান, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের সিঙ্গেল প্রসেস (নামের ছাড়পত্র, কোম্পানি নিবন্ধন ও পেমেন্ট) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দখল সনদ প্রদান সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই সংযুক্তির ফলে এখন থেকে বিডার ২০টি সেবা এবং অন্যান্য ২২টি প্রতিষ্ঠানের ৪৭ সেবাসহ মোট ৬৭টি সেবা অনলাইন ওএসএস সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব হবে।

উদ্বোধনকালে লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, বিডার ওএসএস পোর্টালে নতুন চারটি সেবা যুক্ত হওয়ায়, এখন বিনিয়োগকারীরা ঘরে বসেই আরও বেশি বিনিয়োগ সেবা পাবেন। অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) পোর্টালের সেবা গ্রহণের জন্য বিনিয়োগকারীদের অফিসে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে অতি সহজেই মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি আবেদনে কোনো কাগজপত্রের খাত থাকে তাহলে তা মোবাইলে এসএমএস বা ই-মেইলের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: ঊষা রানি রায়

বিশ্ব পরিবার দিবস

পরিবার হোক নিরাপদ আশ্রয়স্থল

প্রশান্ত দে

পরিবার হলো আত্মীক সম্পর্কের সূতিকাগার। আমাদের জীবনের একটি বিশাল অংশ হলো পরিবার। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত আমাদের পরিবারের অবদান অপরিসীম। পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ কেমন হওয়া উচিত, পারিবারিক বন্ধন ও পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা এবং বাস্তবিক অর্থে পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা– এসব কিছুর প্রতি সাধারণ জ্ঞান অর্জন করার প্রথম মাধ্যম পরিবার। এছাড়া একটি সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথমে দরকার সুষ্ঠু পরিবার এবং পারিবারিক শিক্ষা।

১৫ই মে বিশ্ব পরিবার দিবস। ১৯৯৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫ই মে বিশ্ব পরিবার দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়। ১৯৯৪ সালকে জাতিসংঘ বিশ্ব পরিবার বর্ষ ঘোষণা করে। এরপর ১৯৯৫ সাল থেকে দিবসটি প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে।

বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরিবারের গুরুত্ব তুলে ধরতেই মূলত বিশ্ব পরিবার দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এই দিনটিতে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‌্যালিসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবারে ২০২৩ সালে পরিবার দিবসের প্রতিপাদ্য হলো– 'জনতাত্ত্বিক প্রবণতা ও পরিবার'। বিশ্ব পরিবার দিবসের ৩০ বছর উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ২০২৪ সালকে আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে।

পরিবার সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী এমিল ডুরমিখ বলেন, 'পরিবার হচ্ছে একটি মানবিক সংগঠন, যেখানে মানুষ তার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে থাকে।' এ সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়, মানুষ আগে থেকেই দলবদ্ধ জীবনযাত্রা করত, যা পারিবারিক জীবনযাপনের স্বাক্ষরবহ। তবে বিভিন্ন সমাজে নানা সংস্কৃতির পরিবারের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানামুখী ধারা, যে কারণে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে এর গঠন ও অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। শিল্পবিপ্লবের পরে পরিবারের ধরন ও ভূমিকা পালটাতে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক পরিবার বা যৌথ পরিবার ব্যবস্থা থেকে একক বা নিউক্লিয়ার পরিবার হচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানী ফলসমের মতে, 'একক পরিবারের অন্যতম তিনটি কারণ যেমন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা, অলাভজনক শিশুশ্রম এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থিক অনটন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ।'

পরিবারকে বলা হয় সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও সংস্কৃতিতে পরিবারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো ও ঐতিহ্য যাতে অটুট থাকে, আর্থসামাজিক সমস্যাগুলো যাতে পরিবারগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দারিদ্র্য ক্ষেত্রে পরিবারের কাজের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়– সে লক্ষ্যেই এই আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস। মূলত এই দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক ছোটো-বড়ো সকল সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখা। বিশেষ করে, শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের মৌলিক অনেকগুলো কাজ রয়েছে। একদিকে জৈবিক অপরদিকে মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাদান ইত্যাদি। তবে সবচাইতে বড়ো দায়িত্ব শিশুর সামাজিকীকরণ এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ। যে শিশুটি ভবিষ্যতের নাগরিক, তার মনোজগত প্রস্তুত হয় পরিবারে। পরিবারের ধারা কেমন, কী ধরনের প্রথা-রীতিনীতি– এসবের ওপর ভিত্তি করে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। তাই শিশুর সুষ্ঠু পারিবারিক শিক্ষা শিশুর মনে গেথে থাকে, যা তার পরবর্তী জীবনে অসাধারণ ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন সংবিধান আছে, তেমনি পারিবারিক সংবিধানও থাকা দরকার। যেমন– পরিবারের সবার সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলা, সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, মিথ্যে না বলা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরা, নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলোর চর্চার মাধ্যমে অন্তরকে বিকশিত করা।

সুপ্রাচীনকাল থেকে যে যৌথ পরিবারের চিত্র সারা বাংলাজুড়ে ছিল এখন তা অনেকটাই ম্লান। শহুরে জীবনে অনেক আগেই বিলীন হয়েছে যৌথ পরিবারের চিত্র। আগে গ্রামে যৌথ পরিবার দেখা গেলেও এখন তেমন লক্ষণীয় নেই। বংশপরম্পরা এমনকি ঐতিহ্যবাহী পরিবারেও বিলীন হয়ে যাচ্ছে একত্রে বাস করার প্রবণতা। পরিবার মানেই হচ্ছে মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদা, দাদি সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের এই ধারণা প্রচলিত অতীত থেকেই। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, আমরা যেন ততই এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসছি। যেন ক্রমেই 'স্বামী-স্ত্রী-সন্তানে'ই সীমাবদ্ধ করে ফেলছি আমরা পরিবারকে। সেখানে মা-বাবা কিংবা দাদা-দাদিও অনেক সময়

অন্যান্য সবকিছুই আমাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনতে পারে, তবে পরিবারের কখনই পরিবর্তন হয় না। আমাদের শুরু এবং শেষ পরিবারের সাথেই হয়।

উপেক্ষিত হচ্ছে। মা-বাবাকে হয়ত গ্রামের বাড়িতে কাটাতে হচ্ছে নিঃসঙ্গ-অসহায় জীবন। আবার অনেক মা-বাবার ঠিকানা হচ্ছে 'বৃদ্ধাশ্রম'। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে একান্নবর্তী কিংবা যৌথ পরিবারের ধারণা যেন এখন 'সেকেলে' হয়ে গেছে। বিশেষ করে শহুরে জীবন ব্যবস্থায় এই ব্যাপারটি চরম আকার ধারণ করেছে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের সমাজে প্রচলিত যৌথ পরিবারে পারস্পরিক সম্প্রীতি গভীর হয়, অটুট থাকে। অসুখ-বিসুখসহ নানা সমস্যায় একে অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এতে অনেক বড়ো সমস্যাও সমাধান হয়ে যায় অতি সহজে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে যৌথ পরিবার কিংবা সুষ্ঠু পারিবারিক বন্ধন নেই বললেই চলে।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার পরিবারবান্ধব। এর প্রমাণ খুব সহজেই আমরা পাই সরকার প্রণীত 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩' দ্বারা। এই আইনের মাধ্যমে একটি পরিবারে বাবা-মা অবশ্যই ভরণপোষণ লাভের আইনি অধিকার লাভ করবেন, যা ক্ষুণ্ণ হলে যে-কোনো মা-বাবা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন। এ আইনে ভরণপোষণ বলতে খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধা এবং সঙ্গ প্রদানকে বোঝানো হয়েছে। এ আইনে প্রত্যেক সন্তানকে বাবা-মায়ের ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। একাধিক সন্তান থাকলে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এ আইন অনুসারে পৃথকভাবে বসবাস করলেও মা-বাবার সাথে সন্তানরা নিয়মিতভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন ও ভরণপোষণ দেবেন। আইনে বলা হয়েছে, বাবা-মায়ের ভরণপোষণ না দিলে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড এবং তা অনাদায়ে তিন মাস কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। ভরণপোষণে স্ত্রী বা অন্য কেউ বাধা দিলে তিনি অপরাধী হিসেবে গণ্য হবেন। উল্লেখ্য, যদিও এ আইনের নাম পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন তারপরও এই আইনের ৪-এর ক ও খ ধারা অনুযায়ী দাদা-দাদি এবং নানা-নানির অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী সন্তান বা সন্তানেরা পিতা জীবিত না থাকলে দাদা-দাদি জীবিত থাকলে তাদেরকে পিতার মতোই ভরণপোষণ দিতে হবে। আর মাতা জীবিত না থাকলে নানা-নানি জীবিত থাকলে তাদেরকে মাতার মতোই ৩ ধারা অনুযায়ী ভরণপোষণ দিতে হবে। পরিবার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের এই আইন প্রণয়ন এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত। এছাড়া পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে এবং পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্ক ভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়, যা বর্তমানে বহাল রয়েছে।

সময়ের তাগিদে যৌথ পরিবার কিংবা পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার বিষয়টি যখন এই সমাজে ক্রমান্বয়ে গুরুত্বহীন হয়ে উঠছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আজকের এই আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ছোটো-বড়ো সকল সদস্যের নিরাপদ ও নিশ্চিত জায়গা হলো পরিবার। রক্তের বন্ধন মানেই পারিবারিক বন্ধন। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে অকৃত্রিম সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তা অটুট রাখা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের চিরায়ত সমাজ ব্যবস্থায় সুন্দর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে সুন্দর পারিবারিক বন্ধন। পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুর মতো হলে পারিবারিক নানা জটিল সমস্যাও মোকাবিলা করা যায়। সকলের এগিয়ে চলার পথ হয় মসৃণ। এজন্য আসুন আমরা আমাদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই, পারিবারিক দায়িত্ব পালন করি, সবাই মিলেমিশে থাকি।

প্রশান্ত দে: প্রাবন্ধিক

মিনেম্যাটা কনভেনশন অন মার্কারির পক্ষভুক্ত হলো বাংলাদেশ

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবদুল মুহিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ১৯শে এপ্রিল 'মিনেম্যাটা কনভেনশন অন মার্কারি'র অনুসমর্থনপত্র জাতিসংঘের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। জাতিসংঘের পক্ষে এটি গ্রহণ করেন সংস্থাটির ট্রিটি বিভাগের প্রধান ডেভিড ন্যানোপোলোস। এই অনুসমর্থনপত্র দাখিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে উপরোক্ত কনভেনশনের পক্ষভুক্ত (State Party) হয়েছে।

মিনেম্যাটা কনভেনশন অন মার্কারির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানবস্বাস্থ্য এবং পরিবেশকে পারদ ও পারদযৌগের দূষণ থেকে রক্ষা করা। পারদ দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কনভেনশনটি আমাদের পরিবেশ এবং বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পারদ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন ১০টি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে অন্যতম। কনভেনশনে পক্ষভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ এই পৃথিবী ও মানবজাতিকে পারদ দূষণ থেকে বাঁচাতে গৃহীত বৈশ্বিক প্রচেষ্টার প্রতি তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

উল্লেখ্য, ১০ই অক্টোবর ২০১৩ সালে জাপানের কুমামোটোতে অনুষ্ঠিত কূটনৈতিক সম্মেলনে কনভেনশনটি স্বাক্ষরের জন্য সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হয়েছিল। চুক্তিটি অনুসমর্থনের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ ১৪১টি দেশ এই কনভেনশনের পক্ষভুক্ত হলো।

প্রতিবেদন: আরাফাত রহমান

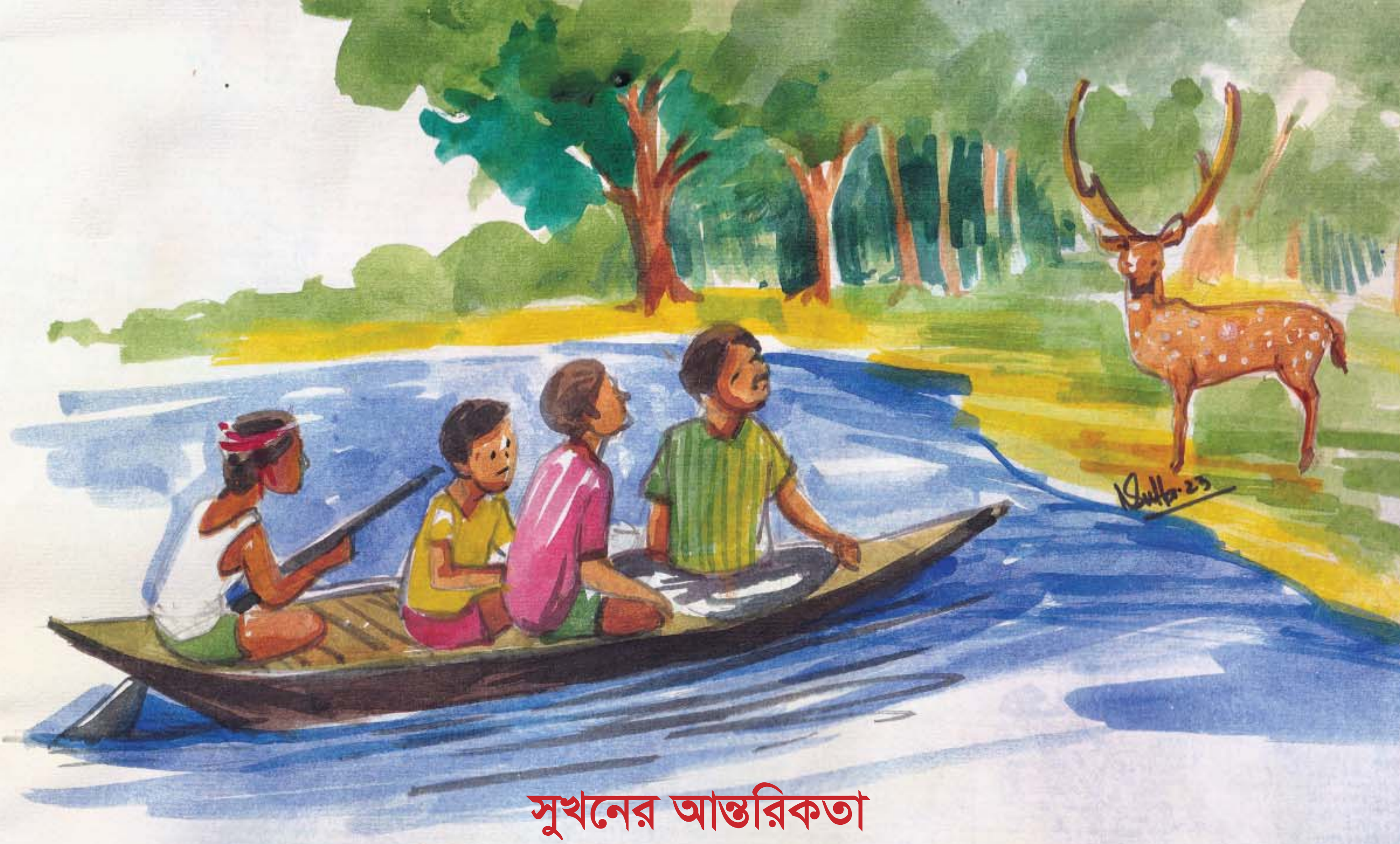

সুখনের আন্তরিকতা

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

সুখন ও শোভন দুই ভাই। সুখন ক্লাস এইটে ও শোভন ক্লাস ফোরে পড়ে। তাদের বাবা একজন সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। চাকরির সুবাদে তাকে ঢাকা ও এর আশপাশে নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জে থাকতে হয়েছে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের প্রায় শেষ পর্যায়ে তিনি মানিকগঞ্জে বদলি হয়েছেন। এখান থেকেই অবসর নিবেন। সুখনের জন্ম হয়েছে মুন্সিগঞ্জে আর শোভন হয়েছে নরসিংদীতে। তবে এই চার জেলার বাইরে সুখনদের কখনও যাওয়া হয়নি। কারণ তাদের মামাবাড়ি ও দাদাবাড়ি এই চার জেলার মধ্যেই। তাই বেড়াতে যেতে হলে এই চার জেলার মধ্যেই যেতে হয়। এবার ঈদের পর হঠাৎ একদিন ছোটোমামা ফোন করে সুখনের মাকে বলল, আপা আমি এবার খুলনার সুন্দরবন এলাকায় বদলি হয়েছি। আমাদের বাড়িটি একেবারে সুন্দরবনের কাছাকাছি। কোয়ার্টারের পাশে নদীর ওপারেই সুন্দরবন। ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে মাঝে মাঝে দেখা যায় হরিণ দৌড়াচ্ছে, গাছে বানর লাফাচ্ছে। নদীতে কুমির, গুঁইসাপ, বনে মাঝে মাঝে বাঘও চোখে পড়ে। সে এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। আপা তুমি যদি একবার পারো দুলাভাইকে বলে সুখন ও শোভনকে নিয়ে এসে এখান থেকে বেড়িয়ে যেও।

একথা শুনে সুখনের মা দুই ছেলেকে ডেকে বলে, তোরা কি সুন্দরবন দেখতে চাস?

সুখন বলে, সুন্দরবন কে না দেখতে চায়? তবে সবার ভাগ্যে কি আর এমন সুযোগ জোটে? ছেলের কথায় হা... হা... করে হেসে ওঠে মা। বলে, তোদের ছোটোমামা ফোন করে বলেছে, তাকে সুন্দরবনের কাছাকাছি বদলি করা হয়েছে। ওদের কোয়ার্টার থেকে মাঝে মাঝে বনের অনেক প্রাণী দেখা যায়। তাছাড়া ট্রলারে করেও নদী পার হয়ে সুন্দরবনে যাওয়া যায় বন্যপ্রাণীদের দেখার জন্য।

একথা শুনে দুভাই খুশিতে নেচে ওঠে।

দুভাই একত্রে: যাব, যাব। মা কবে আমরা ছোটোমামার বাড়িতে যাচ্ছি?

মা: তোদের বাবাকে আগে রাজি করা। বাজার থেকে আসলে বলবি, আমাদের ঈদের ছুটির আরও ৭/৮ দিন বাকি আছে। ছোটোমামা বলেছে আমাদেরকে নিয়ে তার বাড়িতে যেতে। খুলনার এক অংশে সুন্দরবন এলাকায় তার কোয়ার্টার।

বাবা সকালে বাজার-সদাই করে বাড়িতে আসে। দেখে সুখন ও শোভন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কিছু বলতে চাচ্ছে।

বাবা: তোমরা কিছু বলতে চাচ্ছ?

সুখন: ছোটোমামা সকালে ফোন করে আমাদের খুলনা যেতে বলল। মামা সুন্দরবনের কাছাকাছি একটি জায়গায় বদলি হয়েছে। সেখান থেকে আমাদের সুন্দরবন ঘুরিয়ে দেখাবেন।

বাবা: সে তো অনেক দূরের জার্নি। দেখি কী করা যায়।

কিন্তু দুভাই নাছোড়বান্দা। তারা সুন্দরবন দেখবে।

অবশেষে ছেলেদের কথায় সুখনের বাবা যেতে রাজি হলেন। সকালে ঢাকা এসে চারটি ট্রেনের টিকিট কিনল সুখনের বাবা-মা ও দুই ভাইয়ের জন্য।

প্রথমে তারা খুলনা পৌঁছাল। সেখান থেকে একটি মাইক্রো ভাড়া করে ছোটোমামার গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এল। তারপর ট্রলারে একটা জলজ জায়গা পার হয়েই মামার বাসায় পৌঁছাল।

মামার বাড়ির গেট নক করতেই ছোটোমামা তার ছেলে দিপুকে নিয়ে বেরিয়ে এল। ছোট্ট দিপুকে সুখন কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বাসায় ঢুকল। সবাই ঢোকার পর কেয়ারটেকার তাদের লাগেজটি বাসায় পৌঁছে দিলো।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ডাইনিংয়ে বসে তারা সবাই সান্ধ্য খাবার খেল।

সুখনের বাবা ছোটোমামার দিকে তাকিয়ে বলল, তিন বছর পর ভাগ্নেদের পেয়েছিস। এবার চুটিয়ে আড্ডা দে।

ছোটোমামা অন্য ভাগ্নেদের চেয়ে এই দুই ভাগ্নেকেই বেশি আদর করেন। কারণ ছোটোবেলা মামা সুখনদের বাসায় থেকে লেখাপড়া করেছে। তাই তাদের প্রতি আকর্ষণটা বেশি।

রাত হয়ে গেল। সুখনের মা বলল, অনেক রাত হয়েছে। তোরা কথাবার্তা বন্ধ করে খেতে চলে আয়। দুপুরে আমাদের তেমন কোনো খাওয়া হয়নি।

রাতে খাবার শেষে ছোটোমামা বলল, আজ সুখন আর শোভনকে নিয়ে আমার রুমে শোব। রাতে ওদের সঙ্গে গল্প করব।

তাই হলো। ছোটোমামা সুন্দরবনের গল্প বলা শুরু করল। তাদের ফ্ল্যাট থেকে দেখা যায় শিবসা নদী। তার ওপারে সুন্দরবন। ফ্ল্যাটের ছাদে উঠলে মাঝে মাঝে দেখা যায় উন্মুক্ত বনে হরিণদল ছুটে বেড়াচ্ছে। গাছে গাছে বানরের দল এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। এই নদীতে কুমির দেখা যায়, গুঁইসাপ, বিষধর সাপ সবই দেখা যায়। মাঝে মাঝে রাতের বেলা বাঘের ডাকও শোনা যায়। বাঘের কথা শুনে ছোটো ভাগ্নে শোভন ভয়ে কেঁপে ওঠে!

শোভন: বলো কী মামা? তাহলে তোমরা কী কর? ভয় পাও না?

ছোটোমামা: আরে বোকা, আমাদের এই কোয়ার্টারটি হচ্ছে নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে। চারদিকে আলো জ্বালানো থাকে। নিরাপত্তা রক্ষী আছে চারজন। বাঘের কি নিজের মরার ভয় নেই যে এখানে আসবে? আমরা যেমন বাঘকে ভয় পাই, তারাও কিন্তু মানুষকে ভয় পায়।

সুখন বলল: সুন্দরবনের অনেক প্রাণীর কথাতো বললে। এবার চারদিকে যে সবুজের ছড়াছড়ি দেখছি, সুন্দরবনের এই গাছগুলোর নাম বলো। এগুলো অনেকটা অচেনা মনে হচ্ছে।

ছোটোমামা: এই বনে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সুন্দরী গাছ, যার কারণে এই বনের নাম সুন্দরবন। তারপর আছে কেওড়া, গেওয়া, বাইন, গোলপাতা, পশুর, গরান, সিংড়া, হেতাল, খলসী আরও কত কী গাছ, আমার মনেও নেই।

এভাবে কথা বলতে বলতে মামা-ভাগ্নেদের রাত কেটে গেল। সকালের দিকে ঘুমালো।

এদিকে সুখনের মা দরজায় কড়া নেড়ে বলল, তোদের ঘুম ভাঙেনি? অনেক বেলা হয়ে গেছে। তোর বাবা চলে যেতে চাচ্ছে।

মায়ের ডাকে ছোটোমামা ও দুই ছেলের ঘুম ভাঙল। সকালে নাস্তা খেতে ডাইনিংয়ে বসল।

সুখনের বাবা বলল: আমাকে আজ চলে যেতে হবে। স্কুল বন্ধ থাকলেও অফিসরুমে আমার কিছু কাজ আছে। ক্লার্ককে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

ছোটোমামা: দুলাভাই এতদিন পর মাত্র আসলেন। দুদিন না থেকেই চলে যাবেন?

সুখনের বাবা: আমিতো ওদের নিতে আবার আসবই। তখন না হয় দুদিন থেকে যাব।

তারপর সবাইকে বিদায় জানিয়ে সুখনের বাবা মানিকগঞ্জে ফিরে গেল।

ছোটোমামা দুই ভাগ্নেকে বলে, তোদের একদিন সুন্দরবন দেখাতে নিয়ে যাব। ট্রলারে করেই দেখা যাবে সুন্দরবনের সম্পূর্ণ দৃশ্যটি।

পরদিন ছোটোমামা, দুইভাগ্নে আর অফিসিয়াল দুজন গার্ডসহ ট্রলারে করে সুন্দরবন দেখতে বের হলো। চোখ জুড়িয়ে যায় সবুজের সমারোহ দেখে। সুখন বলল, যদি একটা কাগজ-কলম নিয়ে আসতে পারতাম, এমন দৃশ্য দেখে একটি কবিতা লিখে ফেলতে পারতাম।

ছোটোমামা: বাড়িতে গিয়ে লিখিস।

সুখন দেখল কিছু লোক পিঠে বাঁশের তৈরি একটি খাঁচা নিয়ে ট্রলার থেকে নেমে বনে প্রবেশ করল।

সুখন: মামা এরা কারা?

মামা: এরা হচ্ছে সুন্দরবনের বাওয়ালি। এই বনের গাছে গাছে অনেক মৌমাছি বাসা বাঁধে। তারা সেই মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কিছু লোক আসে গাছ কেটে নিতে।

সুখন: এভাবে গাছ কেটে নিলেতো বন উজাড় হয়ে যাবে।

মামা: শুধু কী তাই! অনেকে আসে বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে। কিন্তু চোরাইপথে অনেক লোক গাছ কেটে নেয়। আবার অনেক লোক বাঘ শিকার করতে আসে। তারা চামড়ার লোভে বাঘ মেরে ফেলে। হরিণও শিকার করে অনেকে।

সুখন: বাবার কাছে শুনেছি এক ধরনের অসাধু লোক এই বন থেকে হরিণ শিকার করে নিয়ে যায়। মাংস সুস্বাদু বলে নিজেরাতো খায়ই, খুব গোপনে আশপাশের এলাকায়ও এর মাংস বিক্রি করে। এ ধরনের লোকের কারণে আমাদের এই বন থেকে হরিণ কমে যাচ্ছে। বাঘ কমে যাচ্ছে। বনও সৌন্দর্য হারাচ্ছে।

ছোটোমামা ভাগ্নের কথার কোনো উত্তর দেয় না।

সন্ধ্যার দিকে তারা সুন্দরবন ভ্রমণ করে মামার বাসায় ফিরে। সুখন তখন থেকে খেয়াল করেছে, যে দুজন লোক মামার সঙ্গে ছিল তারা তাদের সঙ্গে ফিরে আসেনি। কীজন্য আসেনি সে তা জানে না। রাতে খাবার খেয়ে দুভাই শুয়ে পড়ে। ক্লান্ত শরীরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সুখন কিছুটা ছাগলের মতো একটি প্রাণীর পিউ পিউ শব্দ পায়। ও রুম থেকে বের হয়ে দেখে মামার নীচতলার বারান্দায় একটি হরিণ বাঁধা অবস্থায় আছে।

সুখন তখনি মামাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে। বলে, ছোটোমামা এ হরিণটি তুমি ধরে নিয়ে এসেছ?

ছোটোমামা: তোদের জন্যই তো নিয়ে এসেছি।

সুখন: আমাদের জন্য!

মামা: আমিতো কখনো হরিণ শিকার করিনি। এর মাংস নাকি অনেক স্বাদ। তোরা এসেছিস বলে ভাবলাম তোদের সঙ্গে একত্রে হরিণটি জবাই করে মাংস খাব। তাই গার্ড দুজনকে দিয়ে হরিণটি ধরে নিয়ে এসেছি।

সুখন: না মামা, এ কাজটি তুমি ঠিক করনি। হরিণ আমাদের সুন্দরবনের একটি সম্পদ। এ সম্পদকে বিনাশ করে দেওয়া ঠিক নয়।

ছোটোমামা দাঁত ব্রাশ করতে করতেই একটি টিপ্পনী কেটে বলল, আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তান!

সুখন মামাকে কিছু বলার আগেই দেখে মামি ডাইনিং রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। তিনি মামাকে বলেন, ভাগ্নের কাছ থেকে কিছু শেখো।

সুখন মামার দিকে তাকিয়ে বলল: আদর্শ পিতার সন্তান না হতে পার, আদর্শ মাস্টারের ছাত্র তো তুমি। মাতো বলেছে, তোমার স্কুল জীবনটি বাবার কাছেই কেটেছে।

মামা আর উত্তর না দিয়ে ওয়াশরুমে চলে যায়। তারপর নাস্তা খাওয়া হলো। নাস্তা শেষে মামা অফিসে চলে গেল।

বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পর সুখন ও শোভন ছোটোমামাকে আবার বোঝাল। ছোটোমামা, আমাদের সুন্দরবন আজ বিশ্ব ঐতিহ্যের একটি অংশ, যাকে উপাধি দেওয়া হয়েছে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। বিশ্বের কোনো বনে চিরহরিৎ সুন্দরবনের ন্যায় এরূপ সৌন্দর্য নেই। এই বনের সৌন্দর্যতো বাঘ, হরিণ, বানর, কুমির, সাপ আরও কত প্রাণী। কত রকম গাছ রয়েছে এই বনে। আমরা যদি এভাবে একের পর এক হরিণ ও বাঘ মেরে ফেলি, তাহলে তো এই বন প্রাণী শূন্য হয়ে যাবে। আর বাঘের সংখ্যা কমে গেলে অসাধু কপট লোকগুলো আরও প্রশ্রয় পেয়ে গাছ কেটে বন উজাড় করে ফেলবে। এর প্রভাব পড়বে পরিবেশসহ সবকিছুর ওপর।

মামি এসে সুখনদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে: ছোটোবেলা শুনেছি সুন্দরবন হচ্ছে বাংলাদেশের। এখন শুনি এর একটি অংশ নাকি ভারতেও আছে। আমরা বন থেকে গাছ কেটে কেটে সুন্দরবনকে ছোটো বানিয়ে ফেলেছি। ওদিকে ভারতীয়রা বেশি করে গাছ লাগিয়ে পশুপাখিদের থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখন এদেশ ছেড়ে ভারতের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রাণীরা তো যেখানে অভয়ারণ্য পাবে সেখানেই যাবে। এভাবে বাঘ-হরিণসহ সকল প্রাণীদের শিকার করলে এ বন হবে প্রাণী শূন্য আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার হয়ে যাবে ভারতীয়দের।

মামি একথা বলার পর কাজে চলে যায়।

দুই ভাগ্নে ও মামির এত কথা শোনার পর ছোটোমামার মন পরিবর্তন হলো। রাতে সুখন ও শোভনকে বলল, চল তোদের দুজনকে নিয়েই আবার হরিণটিকে তার বাসস্থানে ফিরিয়ে দিব।

মামার সিদ্ধান্তে সুখন ও শোভন অনেক খুশি হলো এবং মামাকে ধন্যবাদ জানালো তার শুভবোধ হওয়াতে।

পরদিন ছোটোমামা হরিণটাকে সঙ্গে করে সুখন ও শোভনকে নিয়ে ট্রলারে করে রওনা হলো। ছোটোমামা বলল, হরিণটাকে দুবলার চড়ে নিয়েই ছাড়ব। তাহলে ওর পথ চিনতে সুবিধা হবে।

ট্রলারে বসে সুখন ও শোভন হরিণটাকে কিছু কচিপাতা খাওয়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ভয়ে হরিণটা মুখ লুকিয়ে রেখেছে। করমজল থেকে অনেক দূরে এসে ট্রলারটি ভিড়ল। ছোটোমামা, সুখন ও শোভন হরিণটি নিয়ে দুবলার চরে নামল। ছোটোমামা হরিণটির বাঁধন খুলে দিলো। দেখতে দেখতে এক দৌড়ে হরিণটি বনের মাঝে ছুটে পালালো।

সুখন মামাকে বলল: দেখলে মামা ‘বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে’। হরিণটাকে এতক্ষণ কিছুতেই কচিপাতাগুলো খাওয়ানো গেল না। অথচ তার আবাসভূমিতে আসা মাত্রই পেছন দিকে না তাকিয়ে দৌড়ে চলে গেল তার বাসস্থানে গহীন বনে সুন্দরী গাছের ভেতরে।

ছোটোমামার মন কিছুটা ভারাক্রান্ত বুঝতে পারলাম, আমার কথার কোনো উত্তর না দেওয়াতে।

পরদিন সুখনের বাবা এসে হাজির। তাদের নিতে এসেছে। সুখনের কাছে হরিণ ধরে ছেড়ে দেওয়ার কাহিনি শুনে তিনি বেশ খুশি হলেন। শ্যালককেও ধন্যবাদ জানালেন বনের হরিণ বনে ছেড়ে দেওয়াতে।

মামি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে উচ্চঃস্বরে বলল, দুলাভাই এ কাজটির জন্য সুখনেরই বেশি ধন্যবাদ প্রাপ্য। কারণ তার আন্তরিকতার কারণেই তার মামার মনে পরিবর্তন এসেছে। আর হরিণটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তখন সবাই সুখনের প্রশংসা করতে লাগল।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন-এর সদস্য নির্বাচিত

বাংলাদেশ সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৪-২০২৮ মেয়াদের জন্য কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন (সিএসডব্লিউ)-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। ৫ই এপ্রিল নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পাশাপাশি বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কা, মালি, রোমানিয়া, বলিভিয়া, ব্রাজিল ও কলম্বিয়া এই সংস্থায় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভের পর এক প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ আবদুল মুহিত বলেন, বাংলাদেশ লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের রোল মডেল। এই নির্বাচন লিঙ্গ সমতা, নারীর অধিকার এবং ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ।

বিগত এক দশকে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশ। কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন-এর সদস্য হিসেবে নির্বাচন বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন তুলে ধরা এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সাথে দেশের সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো ভাগ করার একটি অনবদ্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, ৪৫টি সদস্য নিয়ে গঠিত কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অব উইমেন হলো জাতিসংঘের প্রধান বৈশ্বিক আন্তঃসরকারি সংস্থা যা লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। প্রতিবছর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই অঙ্গসংস্থাটির দুই সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় এর সদস্য রাষ্ট্র, সুশীলসমাজ এবং অন্যান্য অংশীজনরা বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ সমতা অর্জনের অগ্রগতি মূল্যায়ন, এক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিতকরণ, বৈশ্বিক মান নির্ধারণ এবং বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য মিলিত হয়। বাংলাদেশ ২০১৯-২০২৩ মেয়াদে এই কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করছে।

প্রতিবেদন: শাহীনা পারভিন

জুলিও কুরি শেখ মুজিব

আসলাম সানী

লালন-রবি-কবি নজরুল
যার ভেতরে হুলুস্থুল
বিশ্বের শোষিতের তিনিই
মহামানব স্বপ্ন মূল
প্রাণ প্রতুল-সখ অতুল।

বিশ্বশান্তির আলোক দীপ
বিশ্বনেতা শেখ মুজিব।

স্বাধিকারে স্বাধীনতায়
বজ্রকণ্ঠ সে নির্ভীক
বাংলাদেশের জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

কৃষক-শ্রমিক-জেলে-তাঁতির
বীর বাঙালির তিনিই তো বীর
বিশ্বের বুকে মহাকালের
দৃপ্ত-উঁচু উন্নত শির
জুলিও কুরি বঙ্গবন্ধু
ভাঙেন শেকল গোলামির
মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বীর
নয়া বিশ্বের নয়া নজির।

বিশ্বশান্তির আলোক দীপ
জুলিও কুরি শেখ মুজিব।

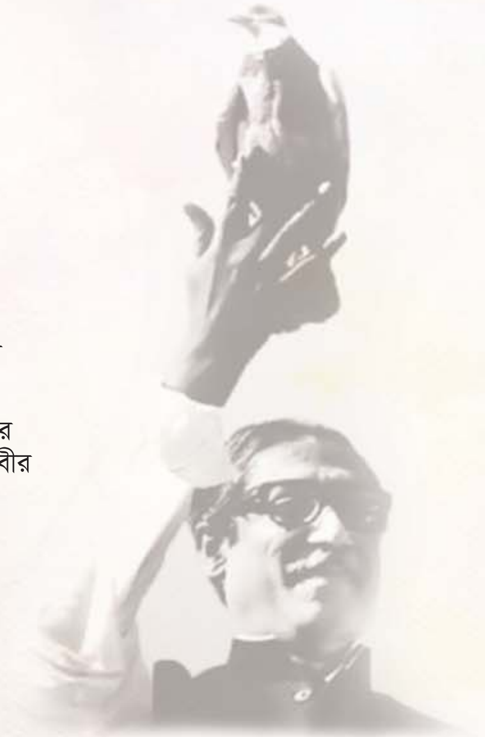

আত্মার শপথ

আরিফ মঈনুদ্দীন

অকুণ্ঠ সমর্থনের ভাষায় কে-একজন কথা বলছেন,
গাছের সবুজ পাতারাও কাঁপছে
সমর্থনের বাতাসে দুলছে মানুষগুলো
যেমন মৃদুমন্দ দোল খাচ্ছে বৃক্ষ পরিবার
সমস্ত নিয়ম-অনিয়ম একাকার করে
প্রভাব প্রতিপত্তির তীর ঘেঁষে নোঙর করেছে জলযান
ছোটো ছোটো জাহাজের মাস্তুলে শান্তির পতাকা
উড়তে উড়তে একসময় ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে

অন্য আর একজন বার বার
গলাখাকারির ভাষায় সতর্ক করছেন পড়শিদের
বৃক্ষ সকল সত্যের হাল ধরে সুদৃঢ় দাঁড়িয়ে আছে
তারা মিথ্যা বুঝে না–সত্যই তাদের আরাধ্য
সবুজ পাতার মতো সত্য
রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের মতন সত্য
আকাশে উড়ন্ত মেঘের মতন সত্য
চরাচর ঢেকে দেওয়া রাতের মতন সত্য

অন্যায়-অনিয়মকে সমর্থন-করা মানুষগুলোর কাছে
সত্য অপসৃত
তারা সবুজ পাতার স্নিগ্ধতা হারিয়ে ফতুরই শুধু নয়
তারা নিঃস্ব–অবিশ্বস্ত আত্মার ধারক
দুজন মানুষ–দুদিকে তাদের পথ
এটা আমাদের কাম্য নয়–এই হোক আত্মার শপথ।

মুজিব আসে ফিরে

মিলন সব্যসাচী

দোয়েল শ্যামা শঙ্খচিল আর ধানশালিকের দেশে
কলমি ফুলের সুবাস মাখা জলের স্রোতে ভেসে।
পদ্মা মেঘনা তুরাগ তিতাস মধুমতীর তীরে
পানসি নায়ে পাল উড়িয়ে মুজিব আসে ফিরে।

ঝিলের জলে পদ্মা-পাতায় জল তরঙ্গে দুলে
প্রজাপতির রঙিন ডানায় ওড়ে শাপলা ফুলে
দূর-দিগন্তের দখিন হাওয়ায় বনফুলের ঘ্রাণে
ফাগুন বনে উদাস ক্ষণে পুলক জাগায় প্রাণে।

নীলাকাশের প্রান্ত ছোঁয়া সবুজ শ্যামল মাঠে
প্রকৃতির এই পাঠশালাতে মগ্ন স্বদেশ পাঠে
শোষক শ্রেণির শত্রু মুজিব দেশ-দরদির মিত্র
একটি মুজিব জন্ম নিলে বদলে যায় মানচিত্র।

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে মহান নেতার বেশে
মরণ পথের আঁধার পিষে ফিরলো আবার শেষে
বিজয় নিশান হাতে নিয়ে হাসলো সবার সুখে
খুশির ঝিলিক ছড়িয়ে দিলো মায়ের মলিন মুখে।

মা মানে তো স্বাধীন স্বদেশ প্রিয় মাতৃভূমি
মহাকালের মহামানব ধন্য মুজিব তুমি
তোমার আসন হৃদয়জুড়ে-ঊর্ধ্বে তোলা শিরে
সোনার বাংলায় চাই তোমাকে শত জনম ঘিরে।

তোমাকে থামাতে পারেনি

সুজিত হালদার

এক সমুদ্র শোকের ঢেউ তোলে আছড়ে পড়ে
এই বাংলার গিরিখাদ নদীতীরে বরেন্দ্রভূমি জুড়ে।

তোমাকে থামাতে পারেনি রাজনৈতিক অস্থিরতা
থামাতে পারেনি প্রকৃতি ও বর্ষণমুখর বিক্ষুব্ধতা
সেদিন ১৭ই মে ১৯৮১ সাল ছিল উৎসবমুখর
ঢাকা কুর্মিটোলা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ছিল
লাখো লাখো উন্মুখ জনতার ঢেউ।

তোমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
কতটা ভীতির ছিল তা তুমি জানো
বিগত ছ’বছর তুমি ঘুমাতে পারনি তা জানি
অনাথ পথচারী হয়ে ঘুরেছ প্রচণ্ড অভিমানী।

তুমি যেন প্রাণকে সঁপে দিতে এসেছ
কোটি কোটি প্রাণের স্পন্দনে
তুমি থামনি, তোমাকে থামানো যায়নি
আজও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছ স্রোতস্বিনী
বেঁচে থাকা গণমানুষের হৃদকম্পনে।

চেতনায় রবীন্দ্রনাথ

মিলি হক

আমাদের রবীন্দ্রনাথ
আমাদের রক্তের ভিতর
চেতনার ভিতর বোধ
অন্তরাত্মা জেগে উঠে
যেমন ফাগুন মাসে
কোকিল ডাকে পলাশ ফোটে
অনুভূতির দুয়ারে আছড়ে পড়ে
হিম চাঁপা রক্তকরবী।
তুমি এক প্লাবন হয়ে
রমনার বটমূলে
বৈশাখি বরণ হয়ে যাও
সে বাঁশি বেজে যায় সেই সুর
এ অখণ্ড বনভূমিতে বেজে যায়
সেই সুরের ধারা
অবিশ্রান্ত ঝরনাধারা
আমাদের জলধারা
স্রোতস্বিনী অন্তঃশীলা হয়ে উঠে
রাঙামাটি আরও রাঙা হয়
কাকলি কূজনে
নিত্যকালের বর্ষা হেমন্ত
যেন রবীন্দ্র কথা কয়
আজও গলা ছেড়ে গাই গান
তোমার প্রসারিত সুর বাড়ে প্রাণ
আকাশ প্রান্ত থেকে ভৈরবী পুরবী
তোমার মর্যাদা তোমায় ভালোবাসি।

রবীন্দ্রনাথ

আহসানুল হক

কার রচনা, কাব্যকলা
মোহন গানের সুর ...
সুখানন্দে নাচতে শেখায়
বাঁচার মতো বাঁচতে শেখায়
আলোয় আলোয় ভাসতে শেখায়
দুঃখ-ক্লেদে হাসতে শেখায়
আঁধার করে দূর?

কে সে তিনি বাতিঅলা ?
ছন্দ-সুরের ফেরিঅলা
দাদুর মতো দাঁড়িঅলা
দম্ভ করে চূর।

আর কেউ নন, আর কেউ নন
তিনি স্বজন, কাব্য গগন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিগুরু

শাহ আলম বিল্লাল

গান কবিতা উপন্যাস
সাহিত্যের সব শাখা
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
মেলেছে তাঁর পাখা।

লিখে লিখে দিকে দিকে
ছড়ান জ্ঞানের দ্রুতি
তাঁর প্রেরণায় উজ্জীবিত
শুনছি জনশ্রুতি।

তাঁর লেখাতে উঠেছে ফুটে
স্বদেশ প্রেমের ছবি
লেখার গুণে হলেন তিনি
বিশ্ববাসীর কবি।

রবির আলো চতুর্দিকে
করছে ঝিকিমিকি
কবিগুরুর জন্মদিনে
এই ছড়াটা লিখি।

প্রিয় কবি

সোহেল বীর

চুরুলিয়ার ছেলে তুমি দুঃখ ছিল মনে
তাইতো তোমায় দুখু নামে চিনতো সকল জনে।

লিখলে তুমি কাব্য-ছড়া শিকল 'ভাঙার গান'
লিখলে তুমি 'বিদ্রোহী' ও লিখলে 'ব্যথার দান'।
'সর্বহারা' 'প্রলয় শিখা' কিংবা 'বিষের বাঁশি'
আবার তুমি 'জাহান্নামে' হাসো পুষ্পের হাসি।
'মৃত্যুক্ষুধা' 'বাঁধনহারা' কিংবা 'কুহেলিকা'
'অগ্নিবীণা' 'দোলনচাঁপা' 'সাম্যবাদী' লিখা।

লিখলে তুমি 'পুবের হাওয়া' 'চক্রবাক' ও 'ঈদ'
ভাঙলে তুমি লৌহকপাট ভাঙলে জাতির নিদ।
'বাসন্তিকা' 'ঝিলিমিলি' 'গুলবাগিচা'র ফুল
সবার প্রিয় কবি তুমি বিদ্রোহী নজরুল।

নজরুল যদি থাকতেন

সেহাঙ্গল বিপ্লব

এই রোবটিক যুগে যদি নজরুল থাকতেন
ফেসবুকে তাঁর একটি ভেরিফাইড আইডি কি থাকত না?
এবং মুঠোফোনে প্রয়োজনের পাশাপাশি চুটিয়ে প্রেম-গল্প
করতেন না ভক্তদের অনুরোধে?
এখন যদি নজরুল থাকতেন তবে কি লিখতেন–
অগ্নিবীণা, গীতি শতদল, জিঞ্জির, ঝড়?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেন না?
নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির বিপক্ষে কবিতা লিখে
হতেন না সমালোচিত?

আলেয়ার চিত্তনামায় যোগ করতেন চন্দ্রবিন্দু এবং
অনায়াসে ইমেইলে পাঠাতেন বন্ধুদের কাছে পত্রিকায়।
হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, মেসেঞ্জারে প্রমিলার কাছে
খুদে বার্তা লিখে পাঠাতেন, আমার ফিরতে দেরি হবে
তুমি খেয়ে নিও। অথবা আব্বাসউদ্দীনকে ভয়েস মেইলে
বলতেন, খান তোমার সুরের তুলনা হয় না! কিংবা
ঝিঙে ফুলে প্রজাপতি দল চক্রবাক খেতে খেতে
গুলবাগিচায় চোখের চাতক বা ঘুমের ঘোরে
স্বপ্ন দেখতেন দোলন চাঁপার বনে একটি নতুন চাঁদ!
পুতুলের বিয়ে হবে শুনে ঝিলিমিলি সাজ পোশাকের
আড়ালে প্রলয় শিখা বয়ে ফণীমনসার ঝোঁপে
বনের বেদে সেজে বাজাতেন বিষের বাঁশি?

এই সময় যদি নজরুল থাকতেন তবে লিখতেন কি
বাঁধনহারার মতো মর্মস্পর্শী উপন্যাস?
পিরামিড দেখে যিনি মরু-ভাস্কর লিখেন তাঁর
দৃষ্টি এড়ানোর কোনো বস্তু নেই।
তিনি যে যুগবাণী লিখে গেছেন, আজ যদি বেঁচে
থাকতেন তবে এ যুগে তিনি কেমন যুগের বাণী
রিক্তের বেদনে, রাঙা জবা করে বিদ্যাপতির উদ্দেশে
লিখতেন প্রহেলিকা? নার্গিসের জন্য ব্যথার দান
লিখে হতে পারতেন ত্রিশ কোটি বাঙালির প্রিয় কবি?

যদিও পুবের হাওয়ায় উজানে আসতো দুর্দিনের যাত্রী
সিন্ধু হিন্দোলে সন্ধ্যামালতীর ঘরে শোনাতে সঞ্চিতা।
সর্বহারা আর কোনো সাম্যবাদী শেষ সওগাতে সুরসাকী
ছাড়া সাপুড়ে হেনার হাতে শিউলিমালা শোভা পেত?

যদি এ সময়ে নজরুল আয়ুষ্মান থাকতেন
বিয়ে বাড়ির বিবিধ, মধুমালা, বুলবুল এই ধরনের
নামকরণ করতেন কি তাঁর বইয়ের? কিংবা
বাসন্তিকার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে ভাঙার গান-এ
দুঃখী কোনো প্রেমিক রাস্তার পাশে পড়ে নেশায় বুঁদ
এই দৃশ্য দেখে তার দিকে এগিয়ে যেতেন নজরুল?
নাকি বাড়ি ফিরে লিখতেন রুদ্র মঙ্গল কিংবা নির্ঝর?
যিনি নিজেই বাঁধনহারা তিনি লিখেন জুলফিকার!

মা

বিচিত্র কুমার

মায়ের মতো আদর সোহাগ
পাইনি কোথাও আর,
ভালোবাসার শিল্পী সে যে
এই দুনিয়ার।

অসীম তাঁর মমতা যে
বটবৃক্ষের ছায়া,
আঁচল তলে স্বর্গের সুখ
সুগন্ধি এক মায়া।

মা ডাকটি সুমধুর
জুড়াই দেহপ্রাণ,
একটু আড়াল হলে পরে
পড়ে নাড়ির টান।

মাতাপিতার মানমর্যাদার প্রতীক

মো. আব্দুল আউয়াল রণী

খোকন সোনা চাঁদের কণা
আয় না খুকু আয়।
বুকে এসে তৃষ্ণা মিটায়।
তুই যে আমার সাত রাজার ধন
মাতার অহংকারী নারীজীবন।

তুই ছাড়া যে আমার জীবন শুধু গহীন আঁধার
শূন্য উদর, শূন্য ভুবন– সবেতেই অপূর্ণ আমার।

এই জনমে তোরে পেয়ে
আঁধার ভুবনে আলো হাসে ঝলমলিয়ে
তাই স্বর্গীয় আনন্দ থাকে আমার আলয়ে।

তুই যে খোকা বড়ো হয়ে
বিদ্যাশিক্ষায় জ্ঞানে গুণে
ধন্যি ধন্যি করবে জগজ্জনে।

তোর আলোতে হবে যে দূর
সব কুসংস্কার, অশিক্ষা আর অন্ধকার।
প্রতীক যে তুমি মাতাপিতার মানমর্যাদার।

মানুষ

রুহুল গনি জ্যোতি

উল্টে দেখ পাল্টে দেখ রক্ত মাংস হাড় দেখ
যতই কর ব্যবচ্ছেদ
জগৎ জোড়া একই মানুষ সুখে দুখে
স্বপ্ন ফানুস ওড়ায় তারা এক আকাশে
একই আশা ভালোবাসা একই ব্যথা যন্ত্রণা তার
একই সুখে আত্মহারা একই রকম হাসিকান্না
কষ্টে কাতর একই শোকে হচ্ছে পাথর
জয়-পরাজয় একই চাওয়া কল্পনাতেও নেই প্রভেদ।
চর্ম চোখে দেখ তাকে সাদাকালো বাদামি রং
ছোটো-বড়ো যে যাই থাকুক ধর্ম-বর্ণ-গোত্র যা হোক
অনুভূতি একই রকম একই আবেগ দোলায় তাকে
এই সূত্র বেঁধে রাখে
দেশে দেশে যতই থাকুক সীমার দেয়াল
ভিন্ন ভাষায় বলুক কথা
কাঁটাতারে দূরত্বটা যতই বাড়ুক
রক্ত মাংসে একই তারা জীবন নদীর একই ধারা
যেই নদীটা চলছে বয়ে
বুকে নিয়ে হাজারো মত আর পথের ভেদ।

হৃদয়ে মানুষ

ইমরুল ইউসুফ

আজ আমরা পরাধীন নই
আজ আমরা অন্ধকারে নই
আজ আমরা নিরাশ্রয় নই
আজ আমরা অসহায় নই
আমাদের আছে স্বতন্ত্র ইতিহাস
আছেন একজন মৌলিক বাঙালি
যাঁর কণ্ঠস্বরে স্বাধীনতার গান
হৃদয়ে মানুষ আর লাল-সবুজ পতাকা।

ভিজে গেছে

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

ইচামাছের বিচার হলো
উঠলো কেন গাছে
মৌমাছিদের তাড়া খেয়ে
নামতে হলো নীচে।
ভিজে গেছে ঘামে
তামাম শরীর তার
দিব্যি খেয়ে বলল শেষে
নয় ওখানে আর।
মাছের রাজা ইলিশ
বলল হেসে হেসে
কী ফল পেলে তুমি
গাছকে ভালোবেসে?

কারুকাজ

প্রজীৎ ঘোষ

তোমার দুই হাতে কাঁকনের সুর
বহুদিন বাজে না; কি জানি কোন্
গোপন ব্যথায়; ভরে আছে বুক;
তাই তো এ হৃদয় থেকে
হারিয়ে গেছে সুখ।

আঁধারের বুকে তারার রোশনাই
মিটিমিটি জ্বলে, চুপিসারে;
ছোটো ছোটো কথা কয় মেঠো চাঁদ
ভেঙে দেবে শত ব্যর্থতা
ঘোর অন্ধকারে অনমনীয় বাঁধ।

দীপাঞ্জন বনে যে সুখের কোকিল
একাকী কুহুকুহু ডেকেছিল
তার মুখে আজ অন্য কোনো ভাষা নেই;
যেন পাথরের মতো সে নীরব নিথর আজ
বেতস লতার বনে
যেন কারো তীক্ষ্ণ কাঁটায় কারুকাজ।

কখনও আকাশ কখনও নীল সমুদ্র

বশিরুজ্জামান বশির

হতাশাঘন জীবনের এক বৈশাখি বিকেলে
প্রত্যাশার অনুরাগ নিয়ে তোমার আবির্ভাব
তুমি বললে, তুমি আমার প্রেম
সে দিন হৃদয়ে রাঙা উচ্ছ্বাসে
তোমার কোল ঘেঁষে বসেছিলাম
নক্ষত্র সংলাপে
জীবন হয়েছিল কখনও আকাশ কখনও নীল সমুদ্র
কিন্তু আজ?
আজ আর স্বপ্ন দেখা হয় না
যন্ত্রণায় সারা অঙ্গ বুঁদ হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে শুভেচ্ছা বাইডেনসহ পাঁচ বিশ্বনেতার

২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২৪শে এপ্রিল শপথ নেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে বিশ্বনেতাদের অভিবাদন অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জোসেফ আর বাইডেন জুনিয়র, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট সাউলি নিনিসটো, কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট টোকায়েভ, বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো ও সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালাইন বেরসেট পৃথক বার্তায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাঁচ রাষ্ট্রপ্রধানের শুভেচ্ছাসংবলিত পৃথক বার্তা ২৭শে এপ্রিল ঢাকায় পৌঁছায়। বাংলাদেশের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশ্বনেতারা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর জোর দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জোসেফ আর বাইডেন জুনিয়র (জো বাইডেন) রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারি আমাদের সবার জন্য আরও শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়তা করেছে। তিনি আরও বলেন, একসঙ্গে আমরা আমাদের দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন সম্প্রসারিত করেছি। একসঙ্গে আমরা দুর্নীতি মোকাবিলা ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা চালিয়ে যাচ্ছি। আর এভাবে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত বিশ্ব তৈরি করে যাচ্ছি। বাইডেন বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশের মধ্যে অংশীদারি আরও গভীর করতে এবং গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে, মানবাধিকারের অগ্রগতি ও গণতান্ত্রিক নীতি রক্ষাসহ আমাদের অভিন্ন মূল্যবোধের পক্ষে দাঁড়াতে একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে। রিপাবলিক অব ফিনল্যান্ডের প্রেসিডন্ট সাউলি নিনিসটো তাঁর অভিনন্দন বার্তায় বলেন, আমি দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় অঙ্গনে আমাদের দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখতে আগ্রহী। কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট কাসিম-জোমার্ট টোকায়েভ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করায় রাষ্ট্রপতিকে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো মোঃ সাহাবুদ্দিনকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলোয় সফলভাবে বেলারুশ-বাংলাদেশ সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করেছেন। অভিনন্দন বার্তায় সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অ্যালাইন বেরসেট বলেন, সুইজারল্যান্ড একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়তে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় অবিচল অংশীদার ছিল ও তা অব্যাহত থাকবে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনকে ৯ই মে ২০২৩ বঙ্গভবনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২ হস্তান্তর করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ –পিআইডি

সশস্ত্রবাহিনীর শহিদ সদস্য ও বঙ্গমাতার প্রতি রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন সশস্ত্রবাহিনীর শহিদ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। ২৭শে এপ্রিল ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে এবং বনানী কবরস্থানে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এসময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এর আগে রাষ্ট্রপ্রধান শিখা অনির্বাণ পৌঁছালে ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীপ্রধান ও সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান, নৌবাহিনীপ্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও বিমানবাহিনীপ্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নান তাঁকে স্বাগত জানান। শিখা অনির্বাণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ। যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সৈনিকদের স্মৃতিকে জাতীয় জীবনে চির উজ্জ্বল রাখতে এ স্মৃতিস্তম্ভে সার্বক্ষণিক শিখা প্রজ্বলন করে রাখা হয়। শহিদদের

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে রাষ্ট্রপতি বনানী কবরস্থানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। রাষ্ট্রপতি সেখানে কবর জিয়ারত করেন এবং ফাতেহা পাঠ, দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন। মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ই আগস্টের শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহিদ সদস্যদের কবরে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে দেন। এসময় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী ড. রেবেকা সুলতানাও ছিলেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের উন্নয়নের ধারা সমুন্নত রাখতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকৌশলীদের দেশের উন্নয়নের মূল শক্তি হিসেবে অভিহিত করে তাদের বাংলাদেশের বিদ্যমান উন্নয়নের ধারাকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান । তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আপনাদের (প্রকৌশলী) কাছে এটাই আমার একমাত্র চাওয়া। ইনশাল্লাহ, বাংলাদেশের উন্নয়নের যাত্রা কেউ ঠেকাতে পারবে না। ১৩ই মে আইইবি প্রাঙ্গণে ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৬০তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ আহ্বান জানান তিনি।

আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ হিসেবে গড়ে তোলা– এ কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা ‘ডেল্টা প্লান-২১০০’ বাস্তবায়ন করবে যাতে দেশের কেউ আর ভোগান্তির শিকার না হয় এবং এতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম একটি সম্মানজনক ও উন্নত জীবন পাবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার যে উন্নয়ন করেছে তা রাজধানী কেন্দ্রিক নয়। আমরা গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত উন্নয়ন করেছি। সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়ায় গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে অভিবাসনের প্রবণতা কমেছে।

সারা দেশে শতাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা শিল্পায়নের জন্য বিশেষ অঞ্চল সৃষ্টি করেছি যেখানে সব ধরনের সেবা পাওয়া যাবে। খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে আমাদেরকে আবাদি জমিগুলোকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্তরের প্রকৌশলী, কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, প্রকৌশল বিভাগ ও এএমআরই বিভাগের স্নাতকদের হাতে পুরস্কার (স্বর্ণপদক) ও সনদপত্র তুলে দেন।

সব সেক্টরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে

সব সেক্টরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক ও মালিক পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় রেখে জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে নিবেদিত হবেন। আমরা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব, ইনশাল্লাহ। ১লা মে ‘মহান মে দিবস’ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– ‘শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি’।

তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি পরিত্যক্ত কলকারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে

THE RISE OF
BENGAL TIGER

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে এপ্রিল ২০২৩ টোকিওতে দ্য ওয়েস্টিন হোটেলের গ্যালাক্সি বল রুমে জাপান-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিটে বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেন। এরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশ শ্রম আইন যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করে ‘বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮’ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। আমরা রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদানে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছি এবং সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। সব সেক্টরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও সেফটি নিশ্চিতকল্পে জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এবং গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে স্থিতিশীল শিল্পসম্পর্ক এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রমিক ভাই-বোনদের যে-কোনো সমস্যা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন (১৬৩৫৭) চালু করা হয়েছে। শিল্পকারখানায় বিশেষ করে পোশাকশিল্পে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চলমান রয়েছে। নারী শ্রমিকদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দরে দুইটি বহুতল শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবন-সৃজনশীলতার বিকাশে নারীসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় মেধার বিকল্প নেই। সৃজনশীলতা ও মেধার বিকাশে নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। আশা করি, গবেষণা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বিকাশে দেশের নারীসমাজ আরও এগিয়ে আসবে। ২৬শে এপ্রিল ‘বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস’ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য– ‘উইমেন অ্যান্ড আইপি: অ্যাকসিলেরেটিং ইনোভেশন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি’।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ১৪ বছরে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন ২০২২ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ সংশোধন করে ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন ২০১৫ পাস করেছি। এছাড়া ট্রেডমার্ক বিধিমালা ২০১৫, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৫ পাস হয়েছে।

তিনি বলেন, জামদানি, বাংলাদেশের ইলিশ, ঢাকাই মসলিনসহ ১১টি পণ্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। বগুড়ার দই, বাংলাদেশের শীতলপাটি, শেরপুরের তুলশীমালা ধান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা ও ল্যাংড়া আম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধনের জন্য জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ১৯টি পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। আমরা বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন ২০২৩-এর খসড়া প্রণয়ন করেছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমি গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানাই, মেধাসম্পদের পরিচর্যা করুন, জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার হন।

সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়তে বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এমডিবি) মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৮ই এপ্রিল ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ‘উন্নয়ন সহযোগিতা: দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকের ভূমিকা’ শীর্ষক ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলের (ইসিওএসওসি) প্যানেল আলোচনায় পূর্বে ধারণকৃত ভিডিও বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসুন, আমরা এমডিবির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে সহায়তা করে একটি সমৃদ্ধ এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে একত্রে কাজ করি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি বর্তমানে বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রথমত কোভিড-১৯ মহামারি এবং দ্বিতীয়ত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিস্ময়কর প্রভাব পড়েছে। এই জটিল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দুর্বল অংশের স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তুলতে এবং বহুমাত্রিক সংকট মোকাবিলায় উন্নয়ন সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এমডিবি বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একত্রে কাজ করার মাধ্যমে, এমডিবির সম্পদ ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে, আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য আরও টেকসই ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করতে পারি।

চতুর্থ দফায় আরও ৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশজুড়ে চতুর্থ দফায় আরও ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। ১৭ই এপ্রিল তিনি সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে চতুর্থ ধাপে এসব মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। নতুন এসব মসজিদসহ প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে ৯,৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ৫৬৪টির মধ্যে এ পর্যন্ত দুইশো মসজিদ উদ্বোধন করলেন। এর আগে তিনি প্রথম দফায় ২০২১ সালের ১০ই জুন ৫০টি মসজিদ, চলতি বছরের ১৬ই জানুয়ারি দ্বিতীয় দফায় ৫০টি এবং তৃতীয় দফায় ১৬ই মার্চ ৫০টি মসজিদ উদ্বোধন করেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

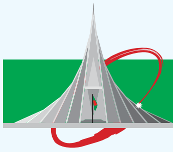

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ একজন মেধাবী তরুণকে হারিয়েছে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আজকে শহিদ শেখ জামালের জন্মদিন। জন্মদিনে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শহিদ শেখ জামাল ১৯৭১ সালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব,

আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও শেখ রাসেলের সাথে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি ছিলেন। সেই বন্দিদশা থেকে তিনি পালিয়ে গিয়ে পায়ে হেঁটে নানাভাবে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আগরতলা গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৮শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের জন্মদিন উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, পুরো ৯ মাস শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, সম্মুখ সমরে অংশ নেন। পরবর্তীতে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্রিটেনের স্যান্ডহার্স্ট থেকে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি একজন মেধাবী তরুণ ছিলেন। একইসঙ্গে সংস্কৃতিমনা মানুষ ছিলেন, সংস্কৃতি চর্চা করতেন। খেলাধুলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি বলেন, শেখ জামালের হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একজন মেধাবী তরুণকে হারিয়েছে। একজন সম্ভাবনাময় তরুণ যিনি দেশকে অনেক কিছু দিতে পারতেন, দেশ গঠনে অবদান রাখতে পারতেন, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ পাথে'র ফুটেজ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংরক্ষণে সহায়ক হবে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ আর্কাইভ থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাসহ দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ ফুটেজ সংগ্রহ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস সংরক্ষণে অত্যন্ত সহায়ক হবে। ১৫ই এপ্রিল যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে মাল্টিমিডিয়া আর্কাইভের বিশ্বখ্যাত সংস্থা ব্রিটিশ পাথে'র দপ্তরে তাদের সাথে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন 'দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ স্মারক অনুসারে বাঙালির দীর্ঘ ২৩ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের ১৫৬টি গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজ পাবে ফিল্ম আর্কাইভ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের পর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের যেসব ফুটেজ ধ্বংস করা হয়েছিল সেগুলোসহ আরও অনেক ঐতিহাসিক ফুটেজ এ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ পাথে থেকে সংগৃহীত ফুটেজ আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও সমৃদ্ধ করবে। ব্রিটিশ পাথে'র প্রধান নির্বাহী আলস্টেয়ার হোয়াইট (Alastair White) এই ফুটেজ সংগ্রহকে বাংলাদেশের মানুষ ও তাদের মুক্তিসংগ্রামের জন্য সম্মানের বলে বর্ণনা করেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল ও ব্রিটিশ পাথে'র প্রধান নির্বাহী আলস্টেয়ার হোয়াইট এ স্মারকে স্বাক্ষর করেন। লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার (প্রেস) আশেক উন-নবী চৌধুরী, মিনিস্টার (রাজনৈতিক) নাসরিন মুক্তি, কাউন্সেলর মাহফুজা সুলতানা, ফিল্ম আর্কাইভের সহকারী পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান, ব্রিটিশ পাথে'র কন্টেন্ট ব্যবস্থাপক জেমস হয়েল (James Hoyle) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে ১৬ শতাংশে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আমাদের দারিদ্র্যের হার মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশের বেশি থেকে এখন ১৬ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বে আমরা ৩৫তম জিডিপির দেশ আর পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপিতে আমাদের অর্থনীতি হচ্ছে ৩১তম। এখন জিডিপির আকারে মালয়েশিয়ার চেয়ে বড়ো অর্থনীতির দেশ আমরা এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের দেশ ২৭তম অর্থনীতির দেশ হবে। ৩রা এপ্রিল 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফডিসি) জহির রায়হান কালার ল্যাব মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী দেশের অগ্রযাত্রা বর্ণনায় এসব কথা বলেন। এর আগে বিএফডিসি চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে মন্ত্রী দিবসটির সূচনা করেন। এর পরপরই চলচ্চিত্র অঙ্গনের শিল্পী-

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৮শে এপ্রিল ২০২৩ ঢাকায় বনানীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন –পিআইডি

কুশলীদের সাথে মন্ত্রী র‍্যালিতে অংশ নেন এবং পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

চলচ্চিত্রের কথা উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, দিন দিন আমরা উন্নতি করছি। বস্তুগত বা অবকাঠামোগত উন্নতির পাশাপাশি মানুষের আত্মিক উন্নতিও প্রয়োজন আর আত্মিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে চলচ্চিত্র। এমন সব সিনেমা বানানো হোক তা যেন মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে দেখতে পারে এবং তা বিনোদনের পাশাপাশি দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখে, মানুষের তৃতীয় নয়ন খুলে দিতে পারে। তাহলে সেই সব সিনেমা বিনোদনের পাশাপাশি দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে, রাষ্ট্রকে জাগ্রত করতে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবে।

দেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ১৯৫৭ সালের এই দিনে তৎকালীন তরুণ নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক পরিষদে বিল উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, সংস্কৃতির সমস্ত শাখার সন্নিবেশে যা সৃষ্টি হয়, সেটি হলো চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রে গান থাকে, নৃত্য থাকে, চলচ্চিত্র সমস্ত শাখার সন্নিবেশ ঘটায়। জাতির পিতা এ সকল কিছু তখনই অনুধাবন করেছিলেন বলেই বিলটি উপস্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবার আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এজন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, সিনেমা হল নির্মাণ এবং পুরানো হল সংস্কারের জন্য সহজ শর্তে ১ হাজার কোটি টাকার এক বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকেই দরখাস্ত করেছেন এবং অনেকে সিনেপ্লেক্স চালু করেছে, এমনকি বন্ধ হয়ে যাওয়া সিনেমা হলও চালু হয়েছে। দুবছর করোনা মহামারির বেড়াজালে আবদ্ধ না থাকলে আরও সিনেমা হল চালু হতো।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, চলচ্চিত্রে অনুদানের পরিমাণ ও সংখ্যা দুইই বেড়েছে। বিএফডিসিতে নতুন দৃষ্টিনন্দন কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ চলছে, সেখানে চারটি শুটিং স্পট থাকবে এবং একজন নির্মাতা সেখান থেকে একটা সিনেমা বানিয়ে মুক্তি দিতে পারবে। এছাড়াও চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য নেওয়া ১০০ একর জায়গায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সকল সুবিধা সৃজন করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

এসএসসি পরীক্ষা শুরু ৩০শে এপ্রিল

চলতি বছরের ২০২৩ সালের এসএসসি (মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট) ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় ৩০শে এপ্রিল । পরীক্ষা চলে ২৩শে মে পর্যন্ত। সব বিষয়েই এবছর এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রতিটি বিষয়ে স্বাভাবিক সময় বা তিন ঘণ্টা পরীক্ষা হয়। সৃজনশীল ও নৈব্যক্তিক প্রশ্ন (এমসিকিউ) ছিল আগের মতোই।

সাধারণত এসএসসি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির শুরুতে ও এইচএসসি পরীক্ষা এপ্রিলের শুরুতে হতো। কিন্তু করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে পুরো শিক্ষাপঞ্জি এলোমেলো হয়ে গেছে। পরীক্ষার এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আগামী বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে।

ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দেশের সরকারি-বেসরকারি ডেন্টাল কলেজের (বিডিএস) ২০২২-২০২৩ সেশনের প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ৭ই মে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মুজতাহিদ মুহাম্মদ হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ৫ই মে দেশের সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের (বিডিএস) ২০২২-২০২৩

পদ্মা সেতু টোল প্লাজা

শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী ঢাকার পাঁচটি কেন্দ্রসহ দেশের ১২টি কেন্দ্রের ১৬টি ভেন্যুতে একযোগে এ পরীক্ষা নেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এবছর ডেন্টালে ভর্তির জন্য ৩৭ হাজার ৫২৮ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেন। সরকারি ও বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিটের সংখ্যা ৩৫টি এবং আসন ১ হাজার ৯৫০টি। এর মধ্যে সরকারি একটি ডেন্টাল কলেজ ও আটটি ডেন্টাল ইউনিট মিলে মোট নয়টি কলেজ ও ইউনিটে আসন রয়েছে ৫৪৫টি। বেসরকারি ১২টি ডেন্টাল কলেজ ও ১৪টি ইউনিট মিলে মোট ২৬টি কলেজ ও ইউনিটে আসন রয়েছে ১ হাজার ৪০৫টি। পরীক্ষার্থীদের প্রথম লক্ষ্য থাকে সরকারি ডেন্টাল কলেজ। সে হিসাবে এবার প্রতিটি আসনের বিপরীতে ৬৮ জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতা করছেন। তবে সরকারি ও বেসরকারি মিলে এবার প্রতি আসনের জন্য ১৯ জন শিক্ষার্থী লড়েছেন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

টোল আদায়ে মাইলফলক

পদ্মা সেতু উদ্বোধনের সাড়ে দশ মাসের মধ্যেই পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৭০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ১২ই মে এ পর্যন্ত ৭০২ কোটি ৪১ লাখ ৭৮ হাজার ৫০০ টাকা টোল আদায় হয়েছে। এ সময়ে পদ্মা সেতু দিয়ে মোট যানবাহন পারাপার হয়েছে ৪৯ লাখ ৪০ হাজার ৫০৭টি। ২০২২ সালের ২৬শে জুন উদ্বোধনের পর থেকে ৩২০ দিনে দৈনিক গড়ে ৩ কোটি ১৯ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকার টোল আদায় হচ্ছে।

দেশে লবণ উৎপাদনে রেকর্ড

চলতি মৌসুমে দেশে রেকর্ড পরিমাণ লবণ উৎপাদন হয়েছে। এ সময়ে মোট লবণ উৎপাদনের পরিমাণ ১৮ লাখ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন। গত ২৫শে এপ্রিল একদিনেই দেশে ১০ হাজার ৯৩০ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় জানায়, ২৫শে এপ্রিলের হিসাব অনুসারে, চলতি মৌসুমে মোট লবণ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন। বিগত বছরে লবণ উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল ১৮ লাখ ৩২ হাজার মেট্রিক টন। গত লবণ মৌসুমে প্রথম লবণ উৎপাদন শুরু হওয়ায় চলতি লবণ মৌসুমে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি (১ বছর), মধ্যমেয়াদি (১-৫ বছর) এবং দীর্ঘমেয়াদি (৫ বছরের ঊর্ধ্বে) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। চলতি মৌসুমে লবণ উৎপাদন চলমান রয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ২০ লাখ মেট্রিক টনের বেশি লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

জাতীয় লবণনীতি ২০২২ অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক) লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। ১৯৬১ সাল থেকে বিসিকের মাধ্যমেই দেশে পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়।

৪৫ বছর পর জমি ফেরত

নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার আগ্রাদ্বিগুণ সীমান্তে প্রায় এক একর জমির মালিকানা নিয়ে দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে ভারতের সঙ্গে বিরোধ চলছিল। অবশেষে সেই জমির মালিকানা ফেরত পেয়েছে বাংলাদেশ। ১২ই এপ্রিল দুই দেশের সার্ভেয়াররা জমির বিভিন্ন কাগজপত্র যাচাই ও মাপজোখ করে দেখেন, বিরোধপূর্ণ জমিটি বাংলাদেশের ভূখণ্ড।

স্থানীয় কৃষক ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সূত্রে জানা গেছে, জমিটি আগ্রাদ্বিগুণ সীমান্তের মেইন পিলার ২৫৭-এর সাবপিলার ২০-এর কাছে অবস্থিত। ওই জমিতে ১৯৭৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের স্থানীয় কৃষকরা চাষাবাদের চেষ্টা করলে বিভিন্ন সময়ে বিএসএফ বাধা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে পত্নীতলা ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দীর্ঘ ৪৫ বছরের বিরোধপূর্ণ প্রায় এক একর জমির মালিকানা বাংলাদেশ ফেরত পায়। সীমান্তবর্তী জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং সীমান্তে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উভয় অধিনায়ক একসঙ্গে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবক তৈরি ও ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তিতে শত শত বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জন করেছি। পাশাপাশি আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জন করেছি। ১০ই মে সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আয়োজিত ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলিউশন সামিটে তিনি এসব কথা বলেন। 'এমপাওয়ারিং ওয়ার্ক ফোর্স ফর দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলিউশন: এ কেস স্টাডি ফর এমপ্লয়মেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ সামিটের আয়োজন করে এটুআই ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২৬শে এপ্রিল ২০২৩ টোকিওর আকাসাকা প্যালেসে জাপানি ভাষায় লিখিত বঙ্গবন্ধুর জীবনী, জেট্রো-আইসিটি বিভাগের যৌথ অংশীদারিত্বের স্মরণিকা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে লিখিত প্রকাশনা জেট্রো চেয়ারম্যান নরিহিকো ইশিগুরু'র হাতে তুলে দেন –পিআইডি

মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশের বড়ো শক্তি হলো মানুষ। প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট মানুষের কথা বলেন। আগামী দিন রোবট-আইওটি-এআই দিয়ে শিল্পকারখানা চলবে। এসব প্রযুক্তির জন্য সংযুক্তির মহাসড়ক তৈরি করতে হবে। আমরা সেই প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি। নতুন শিল্পবিপ্লবের সংযুক্তির মহাসড়ক হিসেবে আমরা ফাইভ-জি পরীক্ষা করে এর উদ্বোধনও করেছি।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রযুক্তি হোক বা জ্ঞান হোক, তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে তা গ্রহণ করবে। তা আত্মস্থ করে প্রয়োগ করতে হবে। ১৯৮৭ সালে কম্পিউটারে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে কম্পিউটার সবার হাতে আসতে শুরু হয়। এর আগে পারমাণবিক কমিশন ও আদমজীসহ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে যোগ-বিয়োগসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হতো।

মন্ত্রী আরও বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পক্ষে-বিপক্ষে মতবিরোধ আছে। এই মতবিরোধ থেকে পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের ধারণা সমাদৃত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব যান্ত্রিক। অন্যদিকে পঞ্চম শিল্পবিপ্লব যন্ত্র ও মানুষের মিশেলে মানবিক। আমাদের কাছে মানুষ আগে যন্ত্র পরে। মানুষ ও যন্ত্রের মিশেলে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেটের মূল্য ২৭ হাজার থেকে ৬০ টাকায়

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় গত চৌদ্দ বছরে সরকার শুধু ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়কই তৈরি করেনি, ইন্টারনেটের প্রতি এমবিপিএসের মূল্য ২৭ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৬০ টাকায় এনেছে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। ৯ই মে ঢাকায় সোনারগাঁও হোটেলে আইএসপিএপি ও বিডিনগ আয়োজিত সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের সম্মেলন– স্যানোগ ৩৯ ও বিডিনগ-এর ১৬তম সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

'এক দেশ এক রেট' নির্ধারণের মাধ্যমে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করা

হয়েছে। ইন্টারনেট এখন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। ২০০৮ সালে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার হতো সাড়ে সাত জিবিপিএস তা বর্তমানে ৪১ শত জিবিপিএস- এ উন্নীত হয়েছে। সে সময়ের ৮ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর স্থলে এখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১২ কোটি। ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা অপরিহার্য। এ বিষয়েও আমরা অত্যন্ত মনোযোগী। এজন্য একইসঙ্গে আইপিভি ৪ ও আইপিভি ৬ অ্যানাবল রাউটার আমদানিতে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য আইপিভি ৬ বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ বিশ্বে আজ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত গতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এরই মধ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ২০২৩ সালের মধ্যে এমন কোনো ইউনিয়ন থাকবে না যেখানে দ্রুত গতির ইন্টারনেট সুবিধা থাকবে না। আমরা দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ অঞ্চলে মোবাইল ফোনের জন্য ফোর জি নেটওয়ার্ক পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি। ২০২১ সালে আমরা ফাইভ জি প্রযুক্তি চালু করেছি।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের চারজনসহ ১১ জন নেটওয়ার্ক প্রকৌশলীকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মেলনের অংশ হিসেবে চারদিন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চলে নেটওয়ার্ক প্রকৌশলীদের কর্মশালা। দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশের ৩০০ প্রকৌশলী অংশ নেয় এতে।

যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

যুব প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ই মে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক দিনব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা রাজধানী ঢাকার মিরপুরে বিইউবিটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে বিসিসি- এর নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার বলেন, যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা, মেধা এবং প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি অন্যতম প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, ফলে আইসিটি চর্চার ব্যাপক সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ধরনের আয়োজন যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উৎসাহ প্রদান করার পাশাপাশি আইসিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলোতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে সকল বাধা এবং চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয় তা হ্রাস করতে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই। তাদের সাথে নিয়েই আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। রণজিৎ কুমার আরও বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ পিলারের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় ছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন, যে বিষয়ে বিসিসি নিরলসভাবে কাজ করেছে এবং আগামীতেও কার্যক্রম চলমান থাকবে।

প্রাথমিকভাবে ১৪ থেকে ২২ বছর বয়স পর্যন্ত আগ্রহীরা ডাক, ই-মেইল এবং অনলাইনের মাধ্যমে ২৬শে এপ্রিল ২০২৩-এর মধ্যে উক্ত প্রতিযোগিতায় তাদের নিবন্ধন সম্পন্ন করেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (এনডিডি) অর্থাৎ মোট ৪ ক্যাটাগরিতে সারা দেশ থেকে মোট ১১৭ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই করা হয়।

জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০২৩-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ক্যাটাগরি থেকে সেরা প্রথম তিনজনকে অর্থাৎ ৪ ক্যাটাগরিতে মোট ১২ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া প্রত্যেক ক্যাটাগরি থেকে একজন করে অর্থাৎ ৪ ক্যাটাগরিতে ৪ জন মেধাবীর নাম আয়োজক কর্তৃপক্ষ বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিযোগীকে পুরস্কার হিসেবে একটি স্যামসাং ব্রান্ডের স্মার্ট ফোন এবং জেনওয়েব টু কোম্পানি কর্তৃক উপহার সামগ্রীসহ ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়। বিজয়ীরা বিসিসি কর্তৃক পরিচালিত উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সে বিনা ফি'তে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এবং বিজয়ী ১২ জনের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে শ্রেষ্ঠ ৪ জন আগামী অক্টোবরে দুবাইয়ে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে বলে জানান বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) ম্যানেজার (সিস্টেমস) এবং এই আয়োজনের সমন্বয়ক মো. গোলাম রব্বানী। এছাড়া আয়োজক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সারা দেশ থেকে আগত প্রত্যেক প্রতিযোগীকে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি

৬ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ইতালি ও হংকং যাচ্ছে বাঘার আম

রাজশাহীতে অপরিপক্ব আম পাড়ার কারণে গত কয়েক বছর ধরে সময় নির্ধারণ করে দিচ্ছে সরকার। ৩রা মে এক বৈঠকে চলতি বছর আম পাড়ার নতুন সময় নির্ধারণ করা হয়। সেই বৈঠকে ৪ঠা মে থেকে গুটি জাতের আম পাড়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রথম দিনে জেলার বাঘা উপজেলা থেকে ৪৪০ কেজি আম রপ্তানি হয়েছে হংকং ও ইতালিতে।

গুটি প্রজাতির আমের এই প্রথম চালান যাচ্ছে হংকং ও ইতালিতে। এটি আগাম জাতের আম। খেতেও খুব ভালো এবং সুস্বাদু। এ আম স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা বেশি। তবে মৌসুমের প্রথম দিন ৩০০ কেজি ইতালি এবং ৭০ কেজি পাকা ও ৭০ কেজি কাঁচা আম হংকংয়ে রপ্তানি করা হয়েছে।

রাজশাহীকে আমের জন্য বিখ্যাত বলা হলেও বাঘা উপজেলা আম প্রধান অঞ্চল হিসেবে খ্যাত। জেলার নয়টি উপজেলার মধ্যে আটটিতে যে পরিমাণ আম উৎপাদন হয়, তার চেয়েও বেশি আম উৎপাদন হয় বাঘা উপজেলায়। প্রায় ৮-১০ বছর ধরে এ উপজেলার আম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। ইতালি, হংকং, নেদারল্যান্ড, থাইল্যান্ড ও রাশিয়াসহ বেশ কিছু দেশে এ উপজেলার আম রপ্তানি করা হয়।

দুবাই থেকে ১০ দিনে চট্টগ্রাম পৌঁছাবে আমদানি পণ্য

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের জেবেল আলী বন্দরে সরাসরি কনটেইনার জাহাজ সার্ভিস চালু হয়েছে। নতুন সার্ভিসের ফলে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রপ্তানি পণ্য ১৫ দিনে জেবেল আলী বন্দরে এবং সেখান থেকে ১০ দিনে চট্টগ্রামে আনার সুযোগ পাবেন ব্যবসায়ীরা। এতে সময়, অর্থ দুটিই সাশ্রয় হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ এই দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাবসা-বাণিজ্যের হাব হলেও দেশের প্রধান চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে কোনো জাহাজ সার্ভিস চালু ছিল না। এর ফলে দুবাই ও আবুধাবিভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহণ করা হতো বিভিন্ন ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর দিয়ে। এতে বাড়তি সময় লাগত এবং ভাড়াও বেশি হতো।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ পরিচালনায় বাংলাদেশের সালমা

দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ফুটবলে ম্যাচ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের নারী রেফারি সালমা আক্তার। ৩রা মে থেকে ১৫ই মে অনুষ্ঠিত সাউথ-ইস্ট এশিয়ান গেমসে (সি-গেমস) সহকারী রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২৯শে এপ্রিল এ খবর নিশ্চিত করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

গত ফেব্রুয়ারিতে এএফসির এলিট প্যানেলে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়েছিলেন সালমা। এর মাধ্যমে আগামী এক বছর এশিয়ার যে-কোনো স্তরের নারী ফুটবলে তার রেফারিং করার সুযোগ তৈরি হয়। আর এই প্যানেলের রেফারি হওয়ার সুবাদে এবার সি-গেমসের ফুটবল ইভেন্টে রেফারিংয়ের সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। দেশের প্রথম নারী এএফসি এলিট প্যানেলের রেফারি হওয়ার পর এটাই প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট সালমার। ৩০শে এপ্রিল কম্বোডিয়ার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়েন তিনি। উল্লেখ্য, দেশের প্রথম ফিফা রেফারি ছিলেন জয়া চাকমা। আর জয়ার পরেই ফিফার সহকারী রেফারি হলেন সালমা।

৪১ জন পেলেন ‘স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা’ অনুদান

৪১ জন নারীকে ‘স্মার্ট নারী উদ্যোক্তা’ অনুদান দিয়েছে সরকারের আইসিটি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্প। ১০ই এপ্রিল জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে দেশের সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের এ অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, জনশুমারি অনুযায়ী, দেশে নারীদের সংখ্যা বেশি। এই সংখ্যা নিয়ে মানবিকভাবে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। নারীরা সহজাতভাবেই উদ্যোক্তা।

সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করে স্পিকার আরও বলেন, আইসিটি ক্ষেত্রেও আমরা পিছিয়ে থাকব না। আমরা যে পারি সেটার প্রমাণ আমরা দিয়েছি এবং আমাদের সক্ষমতা রয়েছে। নারীরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আপনাদের মাঝে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের বড়ো উদ্যোক্তা। সরকার নিজে ব্যাবসা করবে না, সরকার পরিবেশ তৈরি করবে। তিনি আরও বলেন, এই অনুদান এখন ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। প্রথম দফায় ২ হাজার নারী উদ্যোক্তার জন্য অনুদান প্রক্রিয়া চলমান থাকার পর আরও ৫ হাজার নারী উদ্যোক্তাকে অনুদানের আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনুষ্ঠানে ৪১ জন নারী উদ্যোক্তার প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় নারী ডেপুটি গভর্নর হলেন নুরুন নাহার

নতুন ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নুরুন নাহার। ১২ই এপ্রিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি হয়। তাকে তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়োগ কার্যকর হবে ১লা জুলাই থেকে। নুরুন নাহার ১৯৬৫ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে বিএসসি ডিগ্রি এবং এশিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে ২০০১ সালে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর ছিলেন নাজনীন সুলতানা।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ভোলায় পাঁচ কৃষককে পুরস্কার প্রদান

ভোলা জেলা সদরে ২রা মে ‘কৃষিই সমৃদ্ধি’-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে তেল জাতীয় ফসল উৎপাদনে বিশেষ সফলতা অর্জন করায় পাঁচ কৃষককে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ২রা মে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে খামারবাড়ি চত্বরে জেলা প্রশাসক মো. তৌফিক-ই-লাহী চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে সফল কৃষকদের মাঝে সনদ ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

কৃষক পুরস্কার ২০২২-২০২৩

পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ সফল কৃষকরা হলেন– ভোলা সদরের চররমেশ এলাকার মো. জসিমউদ্দিন, বোরহানউদ্দিনের টবগী এলাকার মো. মাকসুদ, দৌলতখানের মদনপুরের মিলন পাটোয়ারী, চরফ্যাশনের নাজিমুদ্দিনের হেলাল উদ্দিন ও লালমোহনের চর উমেদের মো. মিজানুর রহমান।

পারিবারিক সবজি বাগানে কৃষকের বাড়ছে আয়

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ‘এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে’– এই আলোকে প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উপকরণ সহায়তা দিয়ে পুষ্টি বাগানের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। বসত বাড়ির আঙিনায় এ পারিবারিক পুষ্টি বাগান করে সহজেই পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি পূরণ হওয়ায় এ বাগান করার দিকে ঝুঁকছে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার কৃষকরা।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে প্রতি ইঞ্চি কৃষিজমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে গোয়ালন্দ উপজেলায় গড়ে তোলা হয়েছে পারিবারিক পুষ্টি বাগান। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বাগান স্থাপনে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। সার, বীজ, বেড়া ইত্যাদি ব্যাপক সহায়তা দেওয়া হয় যাতে একজন কৃষক সারা বছর সবজি উৎপাদন করতে পারে। উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ১৫৪ জন কৃষকের বাড়িতে এই পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। বেশিরভাগ বাড়িতে ইতোমধ্যেই তৈরি হচ্ছে এই বাগান। প্রতিটি পারিবারিক পুষ্টি বাগানে বিভিন্ন ধরনের বিষমুক্ত সবজি উৎপাদিত হলে কৃষকরা তাদের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি সবজি বাজারজাত করে বাড়তি অর্থ উপার্জন করতে পারবে।

৯৮ হেক্টর জমিতে ঘাস চাষ

দিনাজপুরের খানসামায় গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে জারা, নেপিয়ার ও পাকচং ঘাস চাষে ঝুঁকছেন কৃষক। মাঠে গোখাদ্যের সংকট ও কম খরচে বেশি লাভ আশায় বিদেশি এ ঘাসের চাষ করছেন তারা। উপজেলায় প্রায় ৯৮ হেক্টর জমিতে এ ঘাস চাষ করা হয়েছে।

গবাদি পশুর দানাদার খাদ্যের দাম বেশি হওয়ায় খড় ও নেপিয়ার ঘাসে ঝুঁকছে খানসামার গবাদি পশুর খামারিরা। ফিড সিন্ডিকেটের কারণে খরচ বেশি হওয়ায় এবং খামার লাভ না হওয়ায় প্রাকৃতিক উপায়ে কাঁচা ঘাস ও খড়ের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। ফলে কম খরচে বেশি লাভের ঘাস চাষ বাড়ছে উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে। বাড়ি ও খামারে প্রাকৃতিক উপায়ে গবাদি পশু পালনে ব্যস্ত খামারিরা। দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানে পিছিয়ে থাকা এ অঞ্চলে পশু পালনের মাধ্যমে বাড়ছে কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতা।

এ ঘাস চাষ করে চাষিরা নিজের গবাদিপশুর খাদ্য চাহিদা মেটানোর পর তা বিক্রি করে আয় করছেন। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে ভ্যানে ফেরি করে ঘাস বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন অনেকে। এতে প্রায় সবুজ সোনায় পরিণত হয়েছে ঘাস।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির জানান, প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে খামারিদের মধ্যে নেপিয়ার পাকচং ঘাস চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি আগ্রহী খামারি ও কৃষকদের ঘাস চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। উপজেলায় ৯৮ হেক্টর জমিতে ঘাস চাষাবাদ হয়েছে। এছাড়া সাইলেজ তৈরি করলে অনেক ঘাস একসাথে সংরক্ষণ করা যায়। এতে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঁচা ঘাস বা খড়ের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য হিসেবে অধিক ফলনশীল ঘাসের মধ্যে পাকচং ও নেপিয়ার উল্লেখযোগ্য। খাদ্যমান বেশি থাকায় গবাদিপশুর জন্য এ ঘাস বেশ উপাদেয় ও পুষ্টিকর। প্রাণী সম্পদ বিভাগের উৎসাহে গবাদি পশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণ ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ঘাস চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন খামারি ও কৃষকরা।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেলেন তৃতীয় লিঙ্গের সাতজন

মাহিয়া মাহি, তৃতীয় লিঙ্গের দলনেতা। অসহায়ের মতো বিভিন্ন স্থানে ঘর ভাড়া করে থাকতেন। নিজে একা নন, তার সঙ্গে থাকত আরও ২০ জন। সহজে কেউ ঘর ভাড়া দিত না। নানা জনে নানা কথা বলত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর দিয়ে আমাদের সেই দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সামাজিক পরিবেশে এখন নিজেদের ঘরে বসবাস করতে পারব। এর আগে আমরা ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছি, আমরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ। এভাবে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন তিনি। তিনি ছাড়াও আরও ছয়জন হলেন– রোকেয়া আক্তার, অন্তরা খাতুন, রনি চৌধুরী, নিলিমা, রোকেয়া ও আকাশ মন্ডল।

২রা এপ্রিল রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় জমিসহ প্রধানমন্ত্রীর উপহারের সাতটি ঘর দেওয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন দৌলতদিয়ার হোসেন মন্ডলপাড়ায় নবনির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পে তৈরি করা ঘরগুলো তৃতীয় লিঙ্গের সাতজনের কাছে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

ঘর হস্তান্তরকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন বলেন, মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহারের সাতটি ঘর এখানকার ২০ শতাংশ খাসজমিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এই সাতটি ঘরে ওদের দলের যারা আছে সবাই মিলেমিশে থাকতে পারবে। সমাজের লোকজনও তাদেরকে মানুষ হিসেবে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে। তৃতীয় লিঙ্গের সবাই এখন থেকে আরও সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারবেন। তাদের যে-কোনো প্রয়োজনে আমরা সবসময় পাশে থাকব।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. আবু সাইদ মন্ডল, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. নিজাম উদ্দিন আহমেদ, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মো. শহিদুল ইসলাম, দৌলতদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান মন্ডলসহ আরও অনেকে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা শহরে তাপ কমাতে ২ লাখ গাছ লাগানো হবে

ঢাকা শহরের তাপমাত্রা কমানোর উদ্যোগ হিসেবে দুই বছরে ২ লাখ গাছ লাগানোর ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আতিকুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ৩রা মে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ ঘোষণা দেন। মেয়র বলেন, আমি পাড়ার সাহায্য চাই, মহল্লার সাহায্য চাই, স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সবার সাহায্য চাই। কারণ গাছগুলো লাগানোর পর তা যেন কেউ ভেঙে না ফেলে। গাছগুলোর যেন যত্ন করি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলি।

ঢাকা উত্তর সিটি ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যাড্রিয়েন আর্শট-রকফেলার ফাউন্ডেশনের মধ্যে এদিন একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। এর আওতায় ঢাকার তাপমাত্রা কমাতে উত্তর সিটি এবং ফাউন্ডেশন যৌথভাবে কাজ করবে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বুশরা আফরিনকে উত্তর সিটি করপোরেশনের 'চিফ হিট অফিসার' নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা শহরের তাপমাত্রা কীভাবে কমানো হবে, এর ব্যাখ্যায় মেয়র বলেন, এজন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোসহ নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে প্রকৃতিবান্ধব কিছু কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমরা ছাদবাগানকে উৎসাহিত করছি।

পর্যটকদের সাতক্ষীরার সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

বনবিভাগ ৬ই মে সাতক্ষীরার সুন্দরবনে মৌখিকভাবে পর্যটকদের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্লাস্টিকসহ ক্ষতিকর দ্রব্য সুন্দরবনসংলগ্ন নদীতে নিক্ষেপ বন্ধে এ উদ্যোগ নিয়েছে বন বিভাগের সাতক্ষীরা রেঞ্জ।

পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ সূত্রে জানা গেছে, পর্যটকরা সুন্দরবনে প্রবেশের সময় সঙ্গে করে প্লাস্টিকের পানির বোতল, প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার, ওয়ানটাইম গ্লাস ও প্লেট, চিপসের প্যাকেটসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্য নিয়ে যান। ব্যবহার শেষে এসব দ্রব্য সুন্দরবনসংলগ্ন নদী ও সুন্দরবনের মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে

নদীসহ ও সুন্দরবনের পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। এছাড়া অনেক প্রাণীও মারা যাচ্ছে। এ বিপর্যয় ঠেকাতে ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বনবিভাগ। পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন কর্মকর্তা নূরুল আলম বলেন, প্রতিদিন বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন থেকে ২৫-৩০টি ট্রলারে ৪৫০-৫০০ পর্যটক সুন্দরবনে ভ্রমণে আসেন। এসব ট্রলার থেকে সুন্দরবনসংলগ্ন নদনদী ও বনে যাতে কোনো ধরনের প্লাস্টিক ফেলা না হয়, এজন্য পর্যটক বহনকারী ট্রলার মালিকদের চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে একাধিকবার। সর্বশেষ চিঠি দেওয়া হয় ২৭শে এপ্রিল কিন্তু পর্যটকবাহী ট্রলার থেকে নদী ও বনে প্লাস্টিকের তৈরি পানির বোতল, প্লাস্টিকের পাত্রে খাবার, ওয়ানটাইম গ্লাস-প্লেট, চিপসের প্যাকেটসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্য ফেলা বন্ধ করা যাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে ৬ই মে পর্যটকদের সুন্দরবনে ঢোকার অনুমতি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

MINISTRY OF SHIPPING
Contract Signing Ceremony
Construction of General Cargo Terminal at
hal, Shasanghat (Dhaka) & DEPTC
Chief Guest :
Mr. Khalid Mahmud Chowdhury, MP
Special Guest :
Mr. Md. Mostafa Kamal
Commodore Arif Ahmed Mustafa
Chairman, BIWTA
THE WORLD BANK
BIWTA

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী ১৬ই মে ২০২৩ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিআইডব্লিউটিএ ও বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে দুটি জেনারেল কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ এবং তিনটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও একটি ডিইপিটিসির উন্নয়ন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

নৌপথের অনেক সম্ভাবনা আছে

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের নৌপথকে পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। নৌপথ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে; নৌপথের অনেক সম্ভাবনা আছে। নৌপথের আরও উন্নয়নে প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় যেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, কুচক্রীমহল পদ্মা সেতুর স্বপ্নের প্রকল্প নিয়ে মহাপরিকল্পনা নিয়েছিল। তারা ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থাগুলো দেখেছে বাংলাদেশ অর্থের অপচয় করে না। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। বিশ্বব্যাংকও আমাদের সঙ্গে আছে। বিশ্বব্যাংক-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে বিশ্বব্যাংক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাদের সদর দপ্তরে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মানিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী ও নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তিনি বিশ্বব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ১৬ই মে ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছয়টি প্রকল্পের নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব বলেন। বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল, বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি নুসরাত নাহিদ ববি।

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে চুক্তিপত্রগুলোতে স্বাক্ষর করেন বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষে প্রকল্প পরিচালক মো. আয়ুব আলী, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তমা কন্সট্রাকশন লিমিটেডের প্রতিনিধি মুকিতুর রহমান, এনডিই লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান রায়হান মুস্তাফিজ এবং দায়েং (Daeyang) ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে জি হো ইউম (Ji-Ho-Youm)।

অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সহজতর করার লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পগুলো হলো– অবকাঠামোসহ দুটি জেনারেল কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ, তিনটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ও একটি ডেক অ্যান্ড ইঞ্জিন পার্সোনেল ট্রেনিং সেন্টারের (ডিইপিটিসি) উন্নয়ন।

মেট্রোরেল চলবে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

৩১শে মে থেকে মেট্রোরেল চলবে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। বর্তমানে মেট্রোর সাপ্তাহিক ছুটি মঙ্গলবার হলেও নতুন সময়সূচিতে শুক্রবার বন্ধ থাকবে। মেট্রোরেলের উত্তরা স্টেশন থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এ সময়সূচি কার্যকর হবে। ১৮ই মে রাজধানীর প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) এমডি এম এ এন সিদ্দিক এ তথ্য জানান। ডিএমটিসিএল এমডি বলেন, আমরা আগেই বলেছি ক্রমান্বয়ে সময় বৃদ্ধি করব।

তিনি বলেন, নতুন সময় অনুযায়ী সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত 'পিক আওয়ার' হিসেবে বিবেচনা করে প্রতি ১০ মিনিট পর পর মেট্রো ছাড়বে। বেলা ১১টার পর থেকে ১৫ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো ছাড়বে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। পরবর্তী ৩ ঘণ্টা আবারও ১০ মিনিট পর পর স্টেশন ছাড়বে মেট্রো রেল। সন্ধ্যা ৬টা এক মিনিট থেকে 'নন পিক আওয়ার' ধরে ১৫ মিনিট পরপর মেট্রো চলবে রাত ৮টা পর্যন্ত।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

মা দিবসে মুক্তি পাচ্ছে পরীমনির *মা*

প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার পালন করা হয় 'মা' দিবস। মা দিবসে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনি অভিনীত *মা* চলচ্চিত্রটি। ছোটোপর্দার পরিচালক অরণ্য আনোয়ারের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এটি। ১৯৭১ সালে মৃত ঘোষিত সাত মাস বয়সি সন্তানকে নিয়ে এক অসহায় মায়ের আবেগের গল্প উঠে আসে এই সিনেমায়। তিন দশকের ক্যারিয়ারে আমাদের নুরুল হুদা'র মতো বহু জনপ্রিয় ধারাবাহিক ও একক নাটক নির্মাণ করেছেন নির্মাতা অরণ্য আনোয়ার। নিজের প্রথম সিনেমা মুক্তি প্রসঙ্গে অরণ্য আনোয়ার সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, সিনেমাটি শুধু বাংলাদেশ নয়, ইউরোপ-আমেরিকার কয়েকটি দেশেও মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পরীমনি ছাড়াও এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন আবুল কালাম আজাদ, সাজু খাদেম, ফারজানা ছবিসহ অনেকেই।

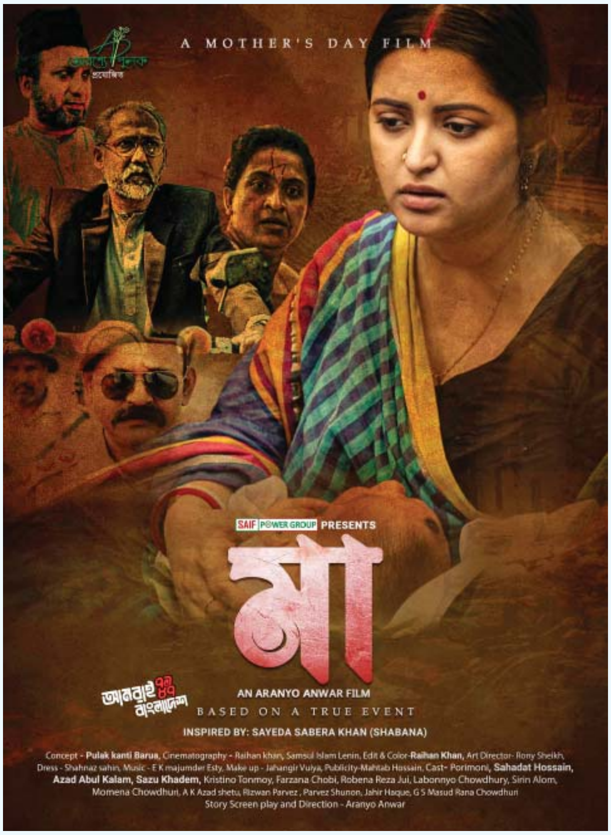
A MOTHER'S DAY FILM
SAIF POWER GROUP PRESENTS
মা
আমরাই ৭১ ৪৭ বাংলাদেশ
AN ARANYO ANWAR FILM
BASED ON A TRUE EVENT
INSPIRED BY: SAYEDA SABERA KHAN (SHABANA)
Concept - Pulak kanti Barua, Cinematography - Raihan khan, Samsul Islam Lenin, Edit & Color-Raihan Khan, Art Director- Rony Sheikh, Dress - Shahnaz sahin, Music - E K majumder Esty, Make up - Jahangir Vulya, Publicity-Mahtab Hossain, Cast- Porimoni, Sahadat Hossain, Azad Abul Kalam, Sazu Khadem, Kristino Tonmoy, Farzana Chobi, Robena Reza Jui, Labonnyo Chowdhury, Sirin Alom, Momena Chowdhuri, A K Azad shetu, Rizwan Parvez , Parvez Shunon, Jahir Haque, G S Masud Rana Chowdhuri
Story Screen play and Direction - Aranyo Anwar

চির নূতনেরে দিলো ডাক পঁচিশে বৈশাখ

'মোর চিত্ত-মাঝে/ চির-নূতনেরে দিলো ডাক/ পঁচিশে বৈশাখ।' জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এভাবেই নিজের হৃদয়ে নূতনের আহ্বান উপলব্ধি করেছিলেন। আজ আবার বর্ষ ঘুরে এল তাঁর জন্মতিথি। ২৫শে বৈশাখ তাঁর ১৬২তম জন্মবার্ষিকী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অমিত প্রতিভায় বাঙালির রুচি ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। সাহিত্যের নানা শাখা থেকে সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা ও নাটক পর্যন্ত বিচিত্র শিল্পক্ষেত্রকে তাঁর প্রতিভার স্পর্শে অনন্য করে তুলেছিলেন। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। ছিলেন বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মা সারদা সুন্দরী দেবীর চতুর্দশ সন্তান। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর চিত্তকে শৈশব থেকেই গড়ে তুলেছিল। জমিদারির কাজে পূর্ব বাংলার নদীপথ, নিসর্গ ও গ্রামীণ জীবনযাত্রা তাঁর মন চিরদিনের জন্য বদলে দেয়।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বাণীতে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাদর্শ ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে চিরদিন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করবে। তিনি বলেন, অহেতুক যুদ্ধ-সংঘাত, মৌলবাদের উত্থান, জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতা, শ্রেণিবৈষম্য, হানাহানি– এসবের কারণে বর্তমান বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন।

সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি নেয়। এবার জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান হয় রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজড়িত নওগাঁর পতিসরে। এছাড়া কবির স্মৃতিময় কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, খুলনার দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজন করা হয় তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলা একাডেমিও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছায়ানট নেয় দুই দিনের কর্মসূচি। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

যেখানে প্রথম বাংলাদেশ

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ইতিহাসের অভিষেক ম্যাচ খেলা দু'দল। ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজও টেস্ট আঙিনায় বিচরণ করছে বহুদিন ধরে। তা সত্ত্বেও তারা যে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি, সেটি করে দেখালো বাংলাদেশ। বাংলাদেশই একমাত্র দল, যারা অপর ১১টি টেস্ট খেলুড়ে দেশের বিপক্ষে পাঁচদিনের ম্যাচ খেলেছে। ৪ঠা এপ্রিল মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট খেলতে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃতিত্ব অর্জন করে বাংলাদেশ।

২০০০ সালের নভেম্বরে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের টেস্ট অভিষেক হয় ভারতের বিপক্ষে। ২৩ বছর পর এগারোতম দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলার কৃতিত্ব অর্জন করল বাংলাদেশ। ১১ দেশের মধ্যে জিম্বাবুয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। এছাড়া ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে বাংলাদেশ। ২৩ বছরে ছয়টি সিরিজ জিতেছে টাইগাররা।

Test Match 2023
Bangladesh vs Ireland
WINNER
Modhumoti Bank Limited
Mr White
Daraz

আইসিসির মাস সেরা সাকিব

মার্চ মাসের জন্য আইসিসির সেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন সাকিব আল হাসান। ১২ই এপ্রিল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আইসিসি। সাকিব শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেছনে ফেলেছেন নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আসিফ খানকে। মার্চ মাসে আইসিসির সেরা নারী ক্রিকেটার হয়েছেন রুয়ান্ডার ১৯ বছর বয়সি অলরাউন্ডার হেনরিয়েট ইশিমরে।

২০২১ সাল থেকে চালু হওয়া এ পুরস্কার দ্বিতীয়বারের মতো জিতলেন সাকিব। এর আগে জিতেছিলেন ২০২১ সালের জুলাইয়ে। সাকিব ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে ২০২১ সালের মে মাসে পুরস্কারটি জিতেছেন মুশফিকুর রহিম।

আরচারি বিশ্বকাপেও নতুন জাতীয় রেকর্ড

আরচারি বিশ্বকাপে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন বাংলাদেশের দুই আরচার মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান ও পুষ্পিতা জামান। ১৮ই এপ্রিল তুরস্কের আনতালিয়ায় অনুষ্ঠিত কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টের কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ২৬ দলের মধ্যে বাংলাদেশ ১৩৮৪ স্কোর করে ২১তম হয়। ২০১৯ সালে জাতীয় আরচারিতে ১৩৮২ স্কোর করে জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন মিঠু রহমান ও সুস্মিতা বণিক। আনতালিয়ায় সেই রেকর্ড ভেঙে মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান ও পুষ্পিতা জামান ১৩৮৪ স্কোর করে নতুন রেকর্ড গড়লেন।

টানা পাঁচ জয়ে সুপার লিগে মোহামেডান

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে পাঁচ দলের সুপার লিগে জায়গা করে নিয়েছে। ১৪ই এপ্রিল বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে শাইনপুকুরকে ৫২ রানে হারায় মোহামেডান। তাদের পয়েন্ট ১১। ফতুল্লায় রূপগঞ্জ টাইগার্সের বিপক্ষে দুই উইকেটে জেতে সিটি ক্লাব। মিরপুরে গাজী গ্রুপের বিপক্ষে ৩০৬ রান তাড়া করে পাঁচ উইকেটে জিতেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। দশম রাউন্ড শেষে সর্বোচ্চ নয়টি করে জয়ে আবাহনী ও শেখ জামালের পয়েন্ট সমান ১৮। নিট রান রেটে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে রয়েছে আবাহনী। আট জয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট
কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

না ফেরার দেশে পঙ্কজ ভট্টাচার্য

আফরোজা রুমা

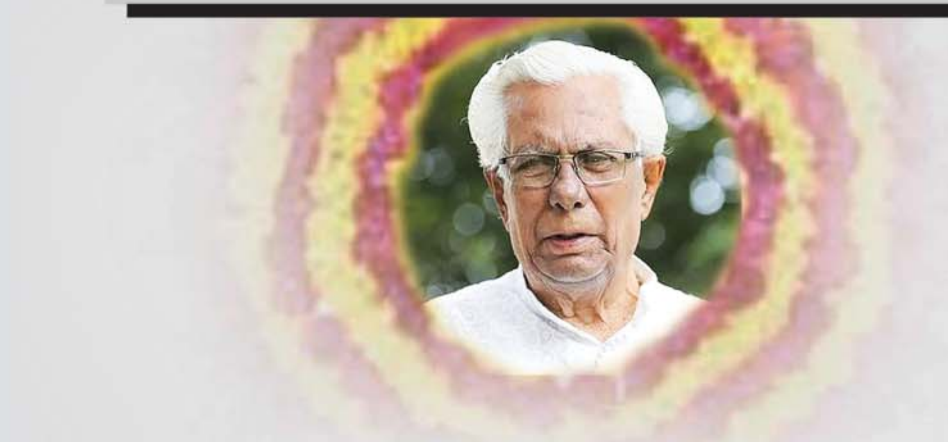

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২৪শে এপ্রিল রাজধানীর হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

পঙ্কজ ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৩৯ সালের ৬ই আগস্ট চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে। এ গ্রামেই জন্মেছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী পুরুষ মাস্টার দা সূর্যসেন ও মহাকবি নবীন চন্দ্র সেন। জন্মভূমির এ ইতিহাস-ঐতিহ্য পঙ্কজ ভট্টাচার্যের জীবনের গতিপথ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আপন ঘর থেকেই পেয়েছিলেন রাজনৈতিক দীক্ষা। প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি উচ্চশিক্ষিত সংস্কারমনা স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। মনিকুন্তলা দেবী ছিলেন তাঁর মা। তিনি তৎকালীন সামাজিক অচলায়তন ভাঙা মহীয়সী একজন নারী। পঙ্কজ ভট্টাচার্যের পিতামাতা ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি ভীষণভাবে অনুরক্ত এবং বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। পিতামহ রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন চট্টগ্রামের একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও সমাজ সংস্কারক।

১৯৬০ সালে পঙ্কজ ভট্টাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। নেতৃত্বগুণে ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। সামরিক শাসনবিরোধী সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করলে ১৯৬৭ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খান তাঁর বিরুদ্ধে 'স্বাধীন বাংলা ষড়যন্ত্র মামলা' দিয়ে তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল। এ মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তারের পর কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছাকাছি সেলে রাখা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে তিনি যোগ দেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। ১৯৭১ সালে ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে বিশেষ গেরিলা বাহিনী তৈরি করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। পঙ্কজ ভট্টাচার্য ১৯৭৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি 'ঐক্য ন্যাপ' নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, প্রবীণ রাজনীতিক ও ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৪শে এপ্রিল এক শোকবার্তায় প্রয়াত পঙ্কজ ভট্টাচার্যের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। এছাড়া এক শোক বার্তায় পঙ্কজ ভট্টাচার্যের আত্মার শান্তি কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান তিনি।

এছাড়া শোক জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, সড়ক, পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী প্রমুখ। পঙ্কজ ভট্টাচার্যের মরদেহ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদমিনার প্রাঙ্গণে রাখা হয়। এরপর পোস্তগোলা মহাশ্মশানে পঙ্কজ ভট্টাচার্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

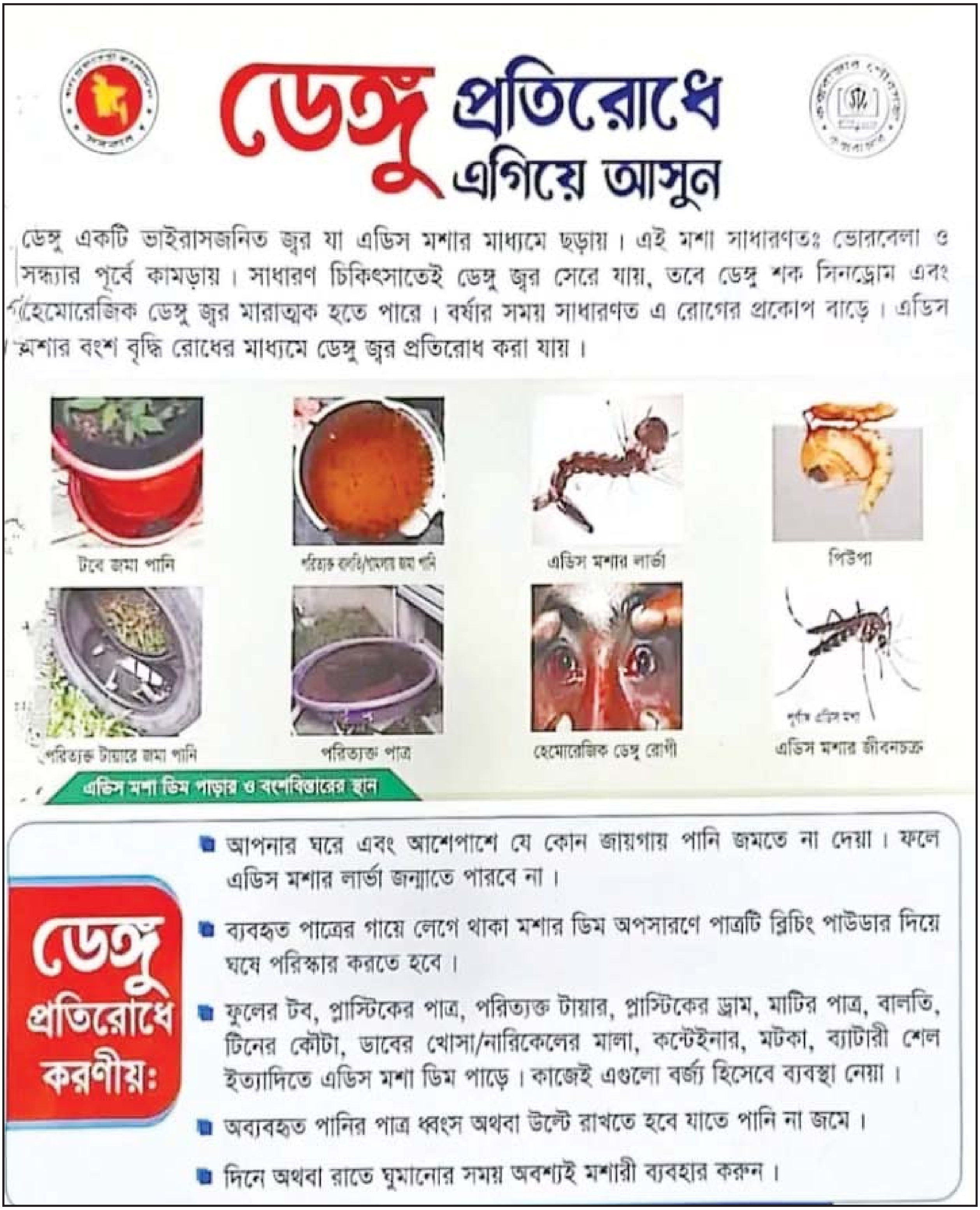

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা পাঠাতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh
Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- ☐ The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- ☐ A write-up within 2000 words is preferred.
- ☐ Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- ☐ The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 11, May 2023, Tk. 25.00

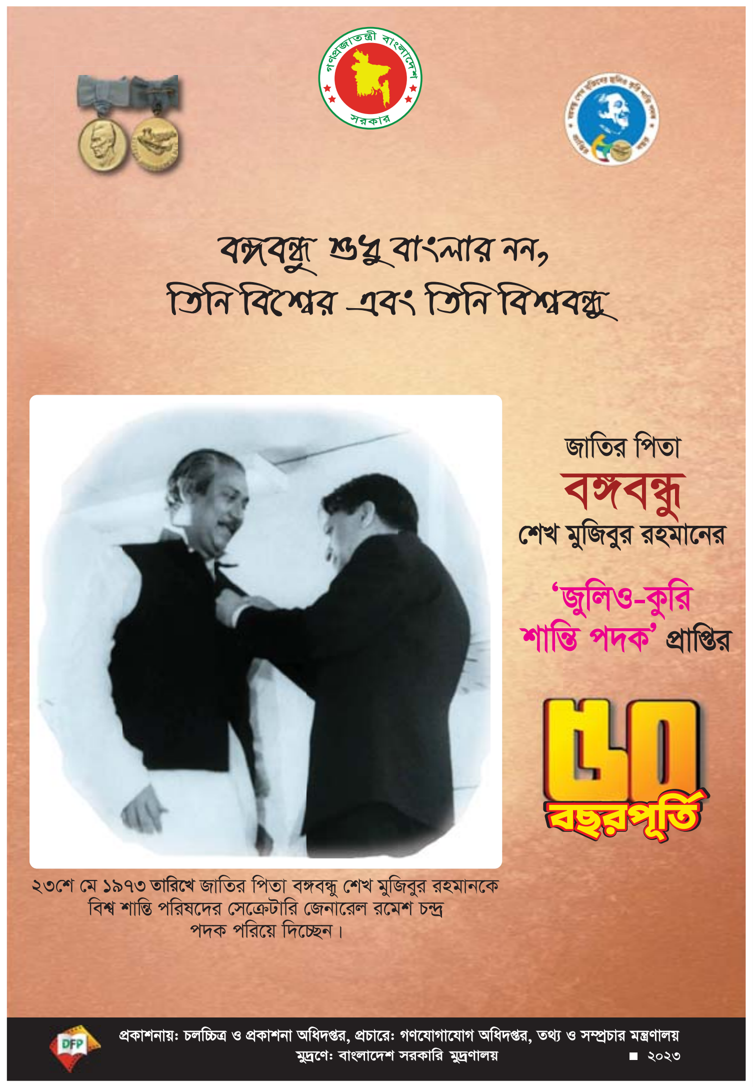

বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলার নন,
তিনি বিশ্বের এবং তিনি বিশ্ববন্ধু

জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
'জুলিও-কুরি
শান্তি পদক' প্রাপ্তির
৫০
বছরপূর্তি

২৩শে মে ১৯7৩ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশ চন্দ্র পদক পরিয়ে দিচ্ছেন।

প্রকাশনায়: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, প্রচারে: গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
মুদ্রণে: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় ■ ২০২৩

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

মে ২০২৩ ▪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০